শুকতারা
পঞ্চম বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
আশ্বিন ১৩৫৯

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান করেছেন : মোঃ রোকনুজ্জামান রনি

এডিট করেছেন : রনি ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সিংহবাহিনী

—কুমারী তপতী রাণী

বাংলাদেশে এলেন হেসে সিংহবাহিনী
মেঘের ফাঁকে দেখছি তাঁকে এ নয় কাহিনী।
নীল জলে তাঁর পড়ছে ছায়া, আয়রে দেখে যা,
সদলবলে মায়ের পায়ে প্রণাম রেখে যা।
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে দুঃখ হবে দূর,
ছন্দে গানে প্রাণটি হবে আনন্দে ভরপূর।
দশভুজার দশটি হাতের মিলবে আশীর্ব্বাদ,
ভরবে আবার জীবন মোদের পূরবে মনের সাধ।
কলস্ কাঁখে জল নিয়ে যায় বঙ্গ-বধূ রে,—
হঠাৎ যেন উজল আলো দেখ্‌লো অদূরে।
এই আলোতে দেখ্‌লো বধূ মধুর ছবি যে,—
পূর্ণ হোলো এতদিনের সাধন সবই যে।
স্বপ্ন আজি সফল হোলো, বিফল হোলো না,
শরৎ-আকাশ ছাপিয়ে দিয়ে ঝরছে রে সোনা!
ওই সোনারই ছটার মাঝে ঘটা কতই যে,—
অভয় বাণী ছড়িয়ে মাতা আসেন যে নিজে।
প্রণাম কর, প্রণাম কর মায়ের রাঙা পায়,—
সকল আপদ দূর হবে ভাই মায়ের করুণায়।
মায়ের পূজা করে যারা ভক্তি ও শ্রদ্ধায়
পল্লীবধূর মতই তারা মায়ের দেখা পায়।

১৩৫৯ } পঞ্চম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা { আশ্বিন

শরৎ এলো

—শ্রীআনন্দ বাগচী

ময়ূরপঙ্খী মেঘের পেখম মেলে
সজল-আকাশ উধাও হয়েছে আজ,
শরৎ আবার সোনালী স্বপন ঢেলে
পরেছে সুনীল সৌম্য শুভ্র সাজ!

দিগ্‌বালিকারা শেফালি মেঘের ডালি
সাজায় নিত্য পুণ্য অমল হাতে,
ঝিক্‌মিক্ করে স্বর্ণরোদের থালি
প্রাণ-বন্যার রাখী-বাঁধা এই প্রাতে।

আকাশ মিতালি জানায় মাটির সাথে
মহালগ্ন কি নিকটে এসেচে ভাই?
বাতাস সানাই বাজায় দিবস-রাতে
মহানন্দের কোন দিন শেষ নাই।

বারোটি মাসের অধীর প্রতীক্ষায়
শরৎ এসেচে পৃথিবীর বনে-মনে,
জননী-পূজার এই মহা দীক্ষায়
জাগুক বাঙালী ভারতের কোণে কোণে !

"আয় ঘুম, আয় !"

হিপ্‌নোটিজম্‌ (Hypnotism) বা সম্মোহন ! অর্থাৎ এই বিদ্যার অধিকারী হলে লোককে বশীভূত করে তাকে দিয়ে অনেক-কিছু অসম্ভব কাজও করানো সম্ভব হয়।

এ বিদ্যার অধিকারী লোক পৃথিবীর সকল দেশেই কম-বেশী কিছু-কিছু দেখা যায়। কিন্তু সম্প্রতি মিঃ পিটার ক্যাসনের নাম তাঁদের সকলকেই ছাপিয়ে উঠেছে !

প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আগে তিনি যখন হঠাৎ একদিন ঘোষণা করেছিলেন, "কাউকে না দেখেও, শুধু টেলিভিশনের মারফৎ আমি আমার সমস্ত জাতিটাকে সম্মোহিত (Hypnotised) করে ফেলবো," তখন সকলেই তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ! কিন্তু তারপর যখন দেখা গেলো, বি. বি. সি.র ঘোষণাকারিণী মহিলারা ও ঝানু ইঞ্জিনীয়ারের দল সত্যই একদিন সম্মোহিত হয়ে সব-কিছু বানচাল করে দিচ্ছেন, কর্তৃপক্ষ তখন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পিটার ক্যাসনের অদ্ভুত শক্তিকে তাঁরা অভিনন্দন জানালেন।

সেই পিটার ক্যাসন সম্প্রতি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে তাঁর খেলা দেখাতে সুরু করেছেন। সমস্ত জাতিকে সম্মোহিত করবার সুযোগ তিনি পাননি বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে যে ক'জনা থাকেন, একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে সম্মোহিত করে তিনি পৃথিবীর 'যাদু-হিপ্‌নোটিষ্ট' হয়ে দাঁড়িয়েছেন। "শুকতারা"র এই সংখ্যায় তাঁরই কয়েকখানি ছবি পাদপূরণে দেওয়া হলো। এমন অসাধারণ 'যাদু-হিপ্‌নোটিষ্ট'কে একটু ভয় ও সমীহ করতে হবে নিশ্চয়ই। কারণ, টেলিভিশন্‌ বা রেডিয়ো মারফৎ মিঃ পিটার ক্যাসন সত্যই একদিন সারা পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলবেন কিনা কে জানে ?

টম কাকার কুটীর

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকার কেন্টাকী শহরে একদিন বিকেলের দিকে এক সম্ভ্রান্ত লোকের বৈঠকখানায় দুজন ভদ্রবেশী লোক কথাবার্ত্তা বলছিলেন। একজন হলেন সেই বাড়ীর মালিক মিঃ সেলবী, দেখলেই বোঝা যায় একজন বনেদী বড়লোক, আর তাঁর সামনে যে লোকটী বসে ছিল, তার পোষাক আর অঙ্গভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায়, হঠাৎ-ধনী কোন সাধারণ লোক। এই ভদ্রবেশী দ্বিতীয় লোকটীর নাম হলো হেলী, একজন ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায়ে হেলী বেশ কিছু পয়সাও করেছে।

দুজনার কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা গেল যে, সেলবী ঋণের দায়ে এই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। সেলবীর ঐশ্বর্য্যের বাইরের ঠাট যদিও বজায় ছিল, কিন্তু ভেতর থেকে তিনি প্রায় অর্থশূন্য হয়ে এসেছেন, তাই হেলীর ঋণ-শোধ দেবার ব্যাপারে তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। হেলীও বুঝতে পেরেছে, এই সুযোগে তাঁকে চাপ দিলেই তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

তাই হেলী বলে ওঠে, আমার কথা আপনি শুনুন, তাহলেই আপনার সব দেনা আমি মকুব করে দেবো ··টম বলে আপনার যে ক্রীতদাসটা আছে, তার সঙ্গে আর একটা সাত-আট বছরের ছোট নিগ্রো ছেলে আমাকে বেচে দিন···এতে আপনার এত ভাববার কি আছে?

এমন সময় ছ'-সাত বছরের একটা নিগ্রো ছেলে সেই ঘরে ঢুকে পড়ে, নতুন লোক দেখে ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ছেলেটাকে দেখেই হেলী বলে উঠলো, এই তো রয়েছে...এটা কে ? টমের সঙ্গে এটাকেও আমাকে বেচে দিন...তাহলেই আপনার দেনা পুরোপুরি শোধ হয়ে যাবে!

হেলী যখন এই প্রস্তাব করছিল, তখন সেই নিগ্রো শিশুটীর মা ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে দরজার কাছে এসে পড়েছিল। মেয়েটীকে দেখে সেলবী বলে উঠলেন, কি ব্যাপার এলিজা ?

মনিবের কথায় এলিজা শান্তভাবে জানালো, দেখুন না হুজুর, হ্যারী বড় দুষ্টু হয়েছে...পালিয়ে একেবারে এখানে চলে এসেছে...তাই তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে যেতে যেতে এলিজা সেই সর্ব্বনাশা প্রস্তাব শুনতে পেলো। তার সারা দেহ-মন ভয়ে কেঁপে উঠলো।

সেলবী হেলীকে বিদায় দিয়ে বল্লেন, তুমি কাল এসো, আমাকে আর একটা দিন ভেবে দেখতে দাও!

ওধারে এলিজা মনিবানী মিসেস্ সেলবীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো, দোহাই মা, আমার হ্যারীকে রক্ষা করুন!

মিসেস্ সেলবী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো ?

এলিজা বলে, এই মাত্র শুনে এলাম হুজুর নাকি হ্যারীকে বেচে দেবেন ?

মিসেস্ সেলবী আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, তা কখনই হতে পারে না, তাঁর মতন দয়ালু ভাল মানুষ কখনই একাজ করতে পারেন না! তুই ভাবিস্ না, আমি দেখছি!

রাত্রিতে মিসেস্ সেলবী যখন সমস্ত ব্যাপার শুনলেন, তখন তাঁর মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো।

মিঃ সেলবী কাতরকণ্ঠে জানালেন, কত দুঃখে যে আমাকে এ কাজ করতে হবে, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে...আমি আমার নিগ্রো চাকরদের বাড়ীর ছেলের মতন চিরকাল দেখে এসেছি...কিন্তু আজ আমি ঋণের দায়ে ঐ পাষণ্ড লোকটার কাছে এমন ভাবে বাঁধা পড়ে গিয়েছি যে, যদি আমি তার কথায় রাজী না হই, তাহলে সে নালিশ করে আমার সমস্ত ক্রীতদাসদের দখল করে নেবে!

চোরের মতন লুকিয়ে এলিজা এই কথা শুনছিল। ভয়ে, ভাবনায়, তার মাতৃ-হৃদয় দুলে উঠলো।

সেলবীদের বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে সেলবীর পুরাণো ক্রীতদাস বুড়ো টমের কুটীর। বুড়ো টমকে সবাই ভালবেসে টমকাকা বলতো। প্রত্যেক রাত্রিতে পাড়ার

সব নিগ্রো ক্রীতদাস টমকাকার কুটীরে এসে জুটতো, খাওয়া-দাওয়া সেরে টমকাকা পুরাণো বাইবেলটা খুলে প্রার্থনা করতে বসতেন। টমকাকার সঙ্গে সবাই প্রার্থনায় যোগ দিতো। নিগ্রোদের অপরূপ কণ্ঠের সেই প্রার্থনাসঙ্গীতে রাত্রির নিস্তব্ধতা পবিত্রতায় যেন জ্যোতিষ্মান্ হয়ে উঠতো!

সেদিন রাত্রির প্রার্থনার পর টমকাকা আর তাঁর স্ত্রী ক্লো-খুড়ী আলাপ করছেন, এমন সময় দরজায় কিসের যেন শব্দ হলো! ক্লো-খুড়ী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখেন, কি সর্ব্বনাশ, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে এলিজা···কাঁদছে!

ক্লো-খুড়ী ঘরের ভেতর নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার এলিজা?

এলিজা কাঁদতে কাঁদতে জানায়, আমি নিজের কানে শুনে এলাম, মনিব টমকাকা আর সেই সঙ্গে আমার এই দুধের বাছাকে বিক্রী করে দিয়েছেন, কাল সকালেই তারা আসবে নিয়ে যাবার জন্যে···সেই জন্যে আমি ঠিক করেছি, যেদিকে চোখ যায় হ্যারীকে নিয়ে পালাবো!

সেই সর্ব্বনাশা সংবাদ শুনে ক্লো কেঁদে ওঠে···টমকাকা নীরবে বাইবেলটা বুকে তুলে নেন।

এলিজা বলে, আমি এখুনি পালাচ্ছি। টমকাকা, তুমিও চলো।

টম গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যাবি?

এলিজা বলে, হ্যারীর বাবাও তার মনিবের অত্যাচারে পালিয়ে গিয়েছে··· যাবার সময় বলে গিয়েছে, কেনাডায় যাচ্ছে···আমি যেমন করে পারি কেনাডায় যাবো···হ্যারীর বাবাকে খুঁজে বার করবো···টমকাকা, তুমি আর দেরী করো না··· এসো···

টমকাকা শান্তকণ্ঠে বল্লেন, তা হয় না এলিজা! তুমি মা, তুমি তোমার ছেলের জন্যে পালাচ্ছো, আমার বলবার কিছু নেই; কিন্তু আমি জীবনে কখনো নেমকহারামি করি নি, এই বুড়ো বয়সে আমি কিছুতেই আমার মনিবের নেমকহারামি করবো না— তাতে আমার যা হয় হোক্!

ক্লো-খুড়ী কেঁদে উঠলেন, বুঝলেন টমকাকার আদর্শ থেকে তাঁকে নড়ানো যাবে না। এলিজাও তা বুঝলো। এলিজার আর দেরী করবার উপায় ছিল না। জানাজানি হয়ে গেলেই, এখুনি তাকে ধরবার জন্যে লোক ছুটবে। সেইজন্যে রাতারাতি যতদূর তাদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া যায়। এলিজা বুকের শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে টমকাকার কাছ থেকে বিদায় নেয়···টম শান্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করে, ভগবান যীশু তোমাকে রক্ষা করুন।

এলিজা অন্ধকার রাত্রে অজানা পথে বেরিয়ে পড়লো।

জীবনে কোনদিন সে নিজের গাঁয়ের বাইরে আর কোথাও যায় নি। মাঝে মাঝে মিসেস্ সেলবীর সঙ্গে সে ওহিও নদীর ওপারে একটা গাঁয়ে যেতো, তাই সেই পথটা তার জানা ছিল। সেই পথ ধরে সে চলতে আরম্ভ করলো। পরের দিন সন্ধ্যার মুখে সে ওহিও নদীর তীরে এসে পৌঁছল।

তখন নদীর তীরে কাছাকাছি দু' চারটে ঘরে সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। সারা দিন এক ভাবে হাঁটার ফলে এলিজার আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না···কিন্তু ছেলের কল্যাণের কথা ভেবে সে নিজের দুঃখকষ্টের কথা ভুলে গিয়েছিল। মাতৃ-স্নেহ আজ তার দুর্ব্বল নারীর দেহে এনে দিয়েছে দুর্ব্বার শক্তি।

এলিজা সোজা পারঘাটায় গিয়ে দেখে, পারঘাটা শূন্য, লোকজন নৌকো-মাঝি কিছুই নেই। তার কারণ সামনেই সে দেখতে পেলো। শীতের নদী, বরফে জমে গিয়েছে। ছোট ছোট বরফের চাঁই ধীরে ধীরে নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। এই বরফের দরুণ নদীতে এখন নৌকো-চলাচল রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

এলিজা হতাশ হয়ে দেখে, নদীর ধারের রাস্তার ওপরে একটা ছোট বাড়ীতে আলো জ্বলছে। বাধ্য হয়ে এলিজা সেই বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। সেটা হলো একটা সরাইখানা, সরাইখানার মালিক একজন স্ত্রীলোক, তিনি তখন সামনের বৈঠকখানায় বসে বুনছিলেন। এমন সময় এলিজা ছেলেকে বুকে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো, এলিজা তখন ক্লান্তিতে দাঁড়াতে পারছিল না। সরাই-এর কর্ত্রী এলিজার অবস্থা দেখে ভেতরে বসতে দিলো এবং হ্যারীকে খেতে দিলো। এলিজা নিজের আসল ব্যাপার প্রকাশ না করে বল্লো, মা, নদীর ওপারে আমার বিশেষ এক আত্মীয় মৃত্যুশয্যায়···আজ রাত্তিরে যেমন করে হোক্ আমাকে ওপারে যেতে হবে!

হোটেলের কর্ত্রী বল্লেন, নদীর অবস্থা তুমি তো চোখের সামনেই দেখেছো। তবে একজন ব্যবসায়ী আজ রাত্তিরে ওপারে যাবে শুনেছি, সে রাত্তিরে খেতে আসবে। তুমি বরঞ্চ ততক্ষণ এই ঘরে অপেক্ষা কর!

এই বলে তিনি রাস্তার ধারে একটা ছোট ঘর খুলে দিলেন। ঘরটাতে একটা ভাঙ্গা খাটও পড়ে ছিল। এলিজা হ্যারীকে সেই বিছানায় শুইয়ে দিলো। এতক্ষণ পর্য্যন্ত এলিজা একবারের জন্যেও হ্যারীকে বুক থেকে নামায় নি; তার বিশ্বাস, মার বুক থেকে বুঝি কেউ ছেলেকে কেড়ে নিতে পারবে না!

হোটেলের কর্ত্রী এলিজাকে কিছু খেতেও দিলো। বাইরের রাস্তার দিকে একটা খোলা জানলা ছিল, এলিজা একমনে বাইরের দিকে চেয়ে ভাবে। এমন সময় ভয়ে সে চমকে ওঠে! রাস্তার ওপর কিছু দূরেই সে দেখে, হেলী নিজে ঘোড়ায় চড়ে সেই দিকে আসছে···আর তার পেছনে দুজন লোক। এলিজা বুঝতে পারে, তাকে

পাবার জন্যেই হেলী বেরিয়েছে···এখুনি সে ধরা পড়বে। হেলী রাস্তা দিয়ে ঘুরে হোটেলের দরজায় এসে কড়া নাড়ে। এলিজা নিরুপায় হয়ে দেখে, সেই ঘরের একটা দরজা রাস্তার দিকে রয়েছে। এলিজা কালবিলম্ব না করে দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং পাগলের মতন নদীর দিকে ছুটতে আরম্ভ করে। হোটেলে ঢুকতে গিয়েই হেলীর নজরে পড়লো, এলিজা নদীর পাড় থেকে নদীর দিকে ছুটে চলেছে। তৎক্ষণাৎ সে তার লোকদের নিয়ে নদীর দিকে ছুটলো। এলিজা মৃত্যুভয় ভুলে গিয়ে চরম দুঃসাহসিকের মতন নদীর ওপর ভাসমান বরফের চাঁই-এর ওপর লাফিয়ে পড়লো। এবং টলতে টলতে পড়তে পড়তে একটা বরফের চাঁই থেকে আর একটা বরফের চাঁই-এর ওপর লাফিয়ে পড়ে। হেলী আর তার লোকজন সে ভাবে জীবন বিপন্ন করতে পারে না। নিরুপায় হয়ে তারা নদী-পারে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। সেই অবসরে রক্তাক্ত দেহে ছিন্ন-পোষাকে এলিজা নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছয়।

দেখে, তীরে দাঁড়িয়ে একজন লোক তাকে লক্ষ্য করছে, তীরের কাছাকাছি লোকটা নিজে জলে নেমে এলিজার হাত ধরে। হাত ধরে তাকে তীরে তুলে এনে লোকটী বলে, আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম তোমার কাণ্ড! সাবাস্ মেয়ে তুমি! আমি তোমারই মত নিগ্রো, তোমার মতন দুঃসাহসিক মেয়ে আমি আর দেখি নি! কি ব্যাপার বলতো?

এলিজা অকপটে তার বিপদের কথা জানায়। বলে, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে অন্তত এই রাতের মতন একটু আশ্রয় দিন···নইলে এখুনি তারা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে·· বাঁচান আমাকে! আমাকে না বাঁচান, আমার এই ছেলেকে বাঁচান!

লোকটী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বোন্, তোমাকে আশ্রয় দেবো এমন জায়গা বা শক্তি আমার নেই···তবে ঐ যে দেখছো বড় বাড়ী···আলো জ্বলছে···সত্যিকারের একজন মহাপুরুষ ঐ বাড়ীতে থাকেন···যদিও তিনি শাদাচামড়াওয়ালা লোক, কিন্তু তিনি আমাদের মতন কালো ক্রীতদাসদের জন্যে অনেক কিছু করেছেন···তুমি ওখানে যাও···আমি জানি, তুমি ওখানে আশ্রয় পাবেই!

এলিজা ধন্যবাদ জানিয়ে সেই বড় বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়।

সেই বড় বাড়ীর মালিক সিনেটর বার্ড সবে মাত্র শহর থেকে তাঁর সরকারী কাজ সেরে বাড়ী ফিরেছেন, এমন সময় বাড়ীর ভেতর রান্নাঘরের দিকে গোলমাল শুনে তিনি স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

মিসেস্ বার্ড তার উত্তর না দিয়ে স্বামীকে রান্নাঘরের দিকে ডেকে নিয়ে

গেলেন। সিনেটর বার্ড দেখেন, একজন নিগ্রো মেয়ে বুকে একটা ছেলেকে নিয়ে কাঁদছে!

—কি ব্যাপার?

এলিজা তার পলায়নের সমস্ত ব্যাপার জানায়। মিসেস্ বার্ডের পায়ের কাছে হ্যারীকে রেখে সে বলে, মনে করুন, মা, এ আপনার ছেলে! আপনিও তো মা!

মাত্র একমাস হলো মিসেস্ বার্ডের একটী ছেলে মারা গিয়েছিল, আজও সে শোক থেকে তিনি সামলে উঠতে পারেন নি। তাই এলিজার কথায় তাঁর মাতৃ-হৃদয় উথলে উঠলো। তিনি এলিজার খাওয়ার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে রাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, কি করা যায়?

সিনেটর বার্ড বল্লেন, যা ব্যাপার শুনলাম, তাতে এই রাত্রিতেই মেয়েটীকে এখান থেকে সরাতে হবে···আমি তো এই সব নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ীদের জানি···ভোর না হতেই তারা ঠিক পেয়াদা-পুলিশ নিয়ে হাজির হবে···তখন আর আমার না বলবার কিছু থাকবে না!

—কিন্তু এই রাত্তিরে, কোথায় যাবে ও?

—আমি নিজে ও-কে নিয়ে যাবো···এই শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে ট্রম্পি বলে আমার একজন মক্কেল থাকেন, সদাশয় মহৎ লোক···শহর থেকে দূরে বনের ভেতর জায়গা—জমি নিয়ে তিনি বসবাস করছেন···সেখানেই আমি মেয়েটীকে রেখে আসবো···

রাত বারোটার সময় সিনেটর বার্ড নিজের গাড়ী করে ট্রম্পির জিম্মায় এলিজা আর তার ছেলেকে রেখে এলেন। এবং এলিজার খরচের জন্যে ট্রম্পির হাতে দশ ডলারের একটা নোটও দিয়ে এলেন।

এধারে জর্জ্জ হ্যারিস্‌কে ধরবার জন্যে তার মনিব চারদিকে হুলিয়া টাঙিয়ে দিয়েছে। হোটেলে হোটেলে সেই হুলিয়া ঝুলিয়ে দিয়েছে, জর্জ্জের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, যে জর্জ্জকে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে প্রভূত পুরস্কার দেওয়া হবে!

একটা বড় হোটেলে একদল শ্বেতাঙ্গ সেই হুলিয়া পড়ছে আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। এই সব হোটেলে কালো নিগ্রোদের প্রবেশ নিষেধ। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীও ছিলেন, তাঁর নাম মিঃ উইলসন। মিঃ উইলসন চুপটী করে দাস-ব্যবসায়ী শ্বেতাঙ্গদের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন!

এমন সময় হোটেলের দরজায় একটা গাড়ী এসে থামলো এবং গাড়ী থেকে একজন সম্ভ্রান্তবেশী লোক নামলো···লোকটীর দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, সম্ভ্রান্তভঙ্গী দেখে

উইলসন উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মনে হলো, লোকটীকে কোথাও যেন দেখেছেন! কিন্তু কোথায় যে দেখেছেন, তা কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। মনের মধ্যে কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। রাত্রিতে সেই হোটেলেই তাঁকে থেকে যেতে হলো, সন্ধ্যে তিনি উপযাচক হয়ে সেই নবাগত অপরিচিত সম্ভ্রান্ত লোকটীর সঙ্গে আলাপ করবার ব্যবস্থা করলেন এবং হোটেলের এক কর্ম্মচারীর মারফৎ তাঁকে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন।

লোকটী ঘরে ঢুকেই আগে দরজার খিলটা বন্ধ করে দিল। উইলসন ভীত হয়ে উঠলেন। দরজা দিয়ে লোকটী শান্তকণ্ঠে বলে উঠলো, ভয় পাবেন না মিঃ উইলসন …আপনার মতন মানব-বন্ধুর শত্রু কোথাও নেই! আমাকে চিনতে পারছেন না তো? চিনবেন কি করে? এ আমার ছদ্মবেশ…মেক্-আপ্-করা…আমি জর্জ্জ হ্যারিস্!

উইলসন অবাক হয়ে বসে পড়লেন।

—এ কি ভয়ংকর দুঃসাহসের কাজ তুমি করেছ জর্জ্জ? যদি ধরা পড়, তাহলে তো আর রক্ষে নেই!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে, আমাদের মত কালো নিগ্রো ক্রীতদাসের জীবনের কি মূল্য মিঃ উইলসন? তাই, এ জীবন যদি ফাঁসির মঞ্চে নষ্ট হয়েই যায়, তাতে কি যায় আসে? কিন্তু তবুও আমি চেষ্টা করবো, এই মানুষের পৃথিবীতে মানুষের মতন বাঁচতে…আপনি হুলিয়াতে দেখেছেন, আমি পালিয়েছি…আমাকে ধরবার জন্যে চারদিকে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা পুলিশ আর চর লাগিয়েছে…আমি ঠিক করেছি কেনাডায় চলে যাবো…সেখানে শাদা-কালো চামড়ার এ ভেদ নেই…সেখানে গিয়ে আমি সেখানকার স্বাধীন নাগরিক হবার চেষ্টা করবো…

উইলসন জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তা না গিয়ে তুমি আবার এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

—আমি শুনলাম, আমার স্ত্রী আর ছেলে নাকি পালিয়েছে…সেই সঙ্গে আমার জানা আরো দুটী ক্রীতদাস ছেলে পালিয়েছে…তাদের উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যেই এই দুঃসাহসিক কাজে নেমেছি…আমার মধ্যে শ্বেতরক্ত থাকার দরুণ আমার চামড়ার রঙ আর গড়ন নিগ্রোদের মতন একেবারে কালো ছিল না, তার ওপর আমি রঙ করেছি,…আমার এই যে চুল দেখছেন, এ হলো পরচুলা…সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গ বণিক সেজে আমি রাত্রিতে রাত্রিতে ঘুরে বেড়াই…যদি কোন রকমে আমার স্ত্রীর সন্ধান পেতে পারি!

তার সেই কাহিনী শুনে উইলসন মুগ্ধ হয়ে বলেন, আমি আশীর্ব্বাদ করছি,

তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক্…এবং আমার আন্তরিকতার প্রমাণ স্বরূপ তুমি আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নাও, কারণ এভাবে হোটেলে হোটেলে ঘোরা রীতিমত পয়সা খরচের ব্যাপার !

—আপনার দয়া আমি জীবনে ভুলবো না…সত্যই এখন আমার বিশেষ টাকার দরকার…তবে এ টাকা আমি ধার হিসেবে নিলাম, যদি কোন দিন পারি, কৃতজ্ঞ অন্তরে পরিশোধ করবো !

মিঃ উইলসন টাকা দিয়ে বল্লেন, সেই সঙ্গে তোমাকে আর একটা বিষয়ে আমি সাহায্য করতে চাই…আমার পরিচিত একদল কোয়াকার ক্রীশ্চান আছেন, তাঁরা গোপনে দুঃস্থ ক্রীতদাসদের সাহায্যের ব্যবস্থা করছেন…তোমাদের আমি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেবো…আমার বিশ্বাস, তাঁদের চেষ্টায় তুমি তোমার স্ত্রী-ছেলের খবর পেতে পারো !

কৃতজ্ঞতায় জর্জ্জের দুচোখ জলে ভরে আসে। অন্তর থেকে প্রার্থনা করে, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন !

ভাগ্যক্রমে ট্রফ্‌ফির চেষ্টায় এলিজা সেই কোয়াকার ক্রীশ্চানদের আড্ডায় গিয়ে আশ্রয় পায়। সেই আড্ডার মধ্যে ফিনিয়াস্ নীরবে সেই দলের মহাব্রতের সমস্ত দায়িত্ব ও বোঝা নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একদিন সেই কোয়াকার আড্ডাতে জর্জ্জ আর এলিজার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সেই অপর দুজন পলাতক নিগ্রো ছেলেও সেখানে এসে জুটলো। ফিনিয়াস্ তাদের নিয়ে ঠিক করলেন, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত পুলিস আর গুপ্তচরদের হাত থেকে এদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। কোয়াকার-দূতেরা খবর নিয়ে এলো যে, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা জেনে গিয়েছে যে এখানে জর্জ্জ লুকিয়ে আছে, তারা অস্ত্র-শস্ত্র আর গুণ্ডাদের নিয়ে কালই আসবে !

সেই রাত্রিতেই ফিনিয়াস্ একটা বড় ওয়াগন গাড়ীতে, জর্জ্জ, এলিজা, সেই দুই জন নিগ্রো, আর তাদের বুড়ী মা আর হ্যারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। জর্জ্জ বহু চেষ্টার ফলে দুটো পিস্তল জোগাড় করেছিল, দরকার হলে তা ব্যবহার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে ছিল।

শহর ছাড়িয়ে পর্ব্বত-সঙ্কুল পথে যখন তারা পরের দিন এসে পড়লো, তখন ঘোড়ারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের গতি স্বভাবতই শ্লথ হয়ে গিয়েছে, এমন সময় দেখে, নীচে থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বন্দুক নিয়ে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর নিযুক্ত গুণ্ডার দল সেই দিকে আসছে। ফিনিয়াস্ নিরুপায় দেখে সেই গাড়ী থেকে নেমে

পাহাড়ের মধ্যে একটা সুবিধাজনক জায়গা আগে থাকতে দখল করে শত্রুপক্ষের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ জেগে উঠলো। যখন তারা কাছাকাছি এসে পড়লো, জর্জ্জ তখন পিস্তল বার করে গুলি ছুঁড়লো। তার অব্যর্থ সন্ধানে দেখতে দেখতে অশ্বারোহীরা আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে লাগলো। জর্জ্জেরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে আসতে হলে, এক একজন করে আসতে হয়, সেইজন্য তারা অনায়াসে জর্জ্জের লক্ষ্য হয়ে পড়ে। সামনের লোকগুলো এইভাবে পড়ে যাওয়ার দরুণ, পেছনের লোকেরা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছুটে পালালো। যখন জর্জ্জ বুঝলো, আর আক্রমণের সম্ভাবনা নেই, তখন তারা বেরিয়ে এসে আবার ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলো। ফিনিয়াস্ তাদের নিয়ে দূরে এক কোয়াকার-কলোনীতে গিয়ে উঠলেন।

···আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে লাগলো।

এতক্ষণ আমরা টমকাকার কোন খবর নিতেই পারি নাই। পরের দিন সকালেই হেলী এসে অশ্রুজলের মধ্যে টমকাকাকে নিয়ে গেল। ক্রীতদাসদের মধ্যে টমকাকার বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাই হেলী রীতিমত চড়াদামে টমকাকাকে এক তূলো-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করলো। সেই সময় আমেরিকার দক্ষিণ-অঞ্চলে বিরাটভাবে তূলোর চাষ হতো। দুর্গম অরণ্যে এই সব তূলোর চাষের জন্যেই প্রধানত নিগ্রো ক্রীতদাসদের

বেচাকেনা চলতো। এই নিগ্রো ক্রীতদাসরাই সেখানে মজুর হয়ে খাটতো। শ্বেতাঙ্গ তূলোর চাষের মালিকেরা এই সব নিগ্রো মজুরদের বনের পশুর মতন দেখতো।

একদল নতুন মজুরের সঙ্গে ষ্টিমারে করে টমকাকাকে দূর দুর্গম অঞ্চলে এক তূলোর কলোনীতে পাঠানো হলো। ষ্টিমারের ডেকের ওপর হাতে-পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো এবং কয়েদীদের মতন প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেক কোমরে-লাগানো আর একটা লোহার চেনে বাঁধা থাকতো, যাতে কোন রকমে তারা পালাতে না পারে, অথবা আত্মহত্যারও চেষ্টা না করতে পারে। টমকাকার সঙ্গে যা জিনিস-পত্র ছিল, তা সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ; কারণ, ক্রীতদাসের ব্যক্তিগত কোন জিনিসই থাকতে পারে না। সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারী পশুদের দৃষ্টি এড়িয়ে টমকাকা তাঁর পুরানো বাইবেলটা শুধু কোন রকমে ছেঁড়া পাৎলুনের পকেটে লুকিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ডেকের ওপর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় অন্য ক্রীতদাসেরা যখন আর্ত্তনাদ করতো বা নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতো, টমকাকা নীরবে স্মরণ করতেন সেই মহা-মানবকে যিনি নিখিলের মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যান বেদনার ক্রুশে।

এই চাষের মালিকের নাম হলো সাইমন লেগ্রী। সে চাবুক হাতে ডেকে এসে উপস্থিত হলো, পেছনে যমদূতের মতন দুজন কাফ্রী, তার সমস্ত অত্যাচার আর অনাচারের বাহক, সাম্বো আর কুইম্বো। সাম্বো আর কুইম্বোর নাম শুনলেই ক্রীতদাসরা ভয়ে কেঁপে উঠতো।

প্রভুর ইঙ্গিতে সাম্বো প্রত্যেক ক্রীতদাসের পাৎলুনের পকেট অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলো, যাতে তারা লুকিয়ে কোন জিনিস না নিয়ে আসতে পারে। টমকাকার পকেট থেকে বেরিয়ে পড়লো, সেই ছোট্ট পুরাণ বাইবেলটা।

দেখেই লেগ্রী হেসে উঠলো, এই বুড়ো, এ বই কার ?

শান্তকণ্ঠে টমকাকা বলেন, আমার !

—হুঁ···দেখছি, ধম্ম করা হয়···চল তুমি, তোমার ভেতর থেকে ধম্ম নিঙড়ে বার করবো !

সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলটা নিয়ে অবজ্ঞা ভরে নদীর জলে ফেলে দেয়। টমকাকা নীরবে চোখ বন্ধ করে থাকেন।

তূলো-ক্ষেতে গিয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ক্রীতদাসের কাজ করতে হয়, পায়ে প্রত্যেকের বেড়ি বাঁধা। সারাদিন খেটে প্রত্যেককে একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের তূলো

...তে বোঝাই করতে হয়। সন্ধ্যার পর সেই সব ঝুড়ি ওজন হয়, যার ...র ওজন কম হয়, সাম্বো আর কুইম্বোর চাবুকে তাকে সে রাত বেহুঁস হয়ে থাকতে হয়।

টমকাকার কাছে যে-মেয়েটী কাজ করছিল, টমকাকা বুঝতে পারে, মেয়েটীর কষ্ট হচ্ছে। টমকাকা লুকিয়ে নিজের ঝুড়ি থেকে তার ঝুড়িতে তুলো তুলে দেয়।

এমন সময় পেছনে নিদারুণ অট্ট-হাসি ফেটে পড়ে।

—বেটা, বুড়ো শয়তান! নিজের কাজ ফাঁকি দিয়ে···

সঙ্গে সঙ্গে পিঠে চাবুক পড়তে থাকে।

সেদিন ওজন করবার সময় স্বয়ং মালিক টমকাকাকে জিজ্ঞাসা করে, এই হারামজাদা, তুই ঐ মেয়েটার সঙ্গে কি করছিলি?

রক্তাক্ত হাতটা ওপরে তুলে টমকাকা প্রার্থনা করেন, ভগবান, তুমি এদের ক্ষমা করো। [পৃঃ ৫১৮

শান্তকণ্ঠে টমকাকা বলেন, ও দুর্ব্বল, তাই ওকে সাহায্য করছিলাম!

লেগ্রি হেসে ওঠে, তাই নাকি? আচ্ছা! এই নে চাবুক···উঠে দাঁড়া হারামজাদা ···লাগা ঐ মেয়েটার পিঠে!

টম তেমনি শান্ত কণ্ঠে বলেন, তা আমার দ্বারা হবে না!

সঙ্গে সঙ্গে লেগ্রি সাম্বোকে ইঙ্গিত করে। সাম্বোর হাতের চাবুক নির্ম্মমভাবে টমের পিঠে পড়তে থাকে। টম অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় কিন্তু তখনো তার মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে, মেরে ফেল্লেও না!

রাত্রিতে নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহে টমকাকা পড়ে থাকেন। যখন

তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো, তখন তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে। অচেতনার ঘোরে বলে উঠলেন, একটু জল !

কে যেন তাঁর মুখে জল দিলো ! জল খেয়ে চোখ তুলে দেখেন, সেই মেয়েটা !

—তুমি ! কেসী ! তুমি কেন এলে ? দেখতে পেলে, এখনি তোমাকে আবার মারবে !

কেসী গর্জ্জন করে ওঠে, তুমি কি ভাবছো, আমি মার খাই নি ? আমাকে মারতে মারতে ওরা এলে গিয়েছে···আমার চামড়া লোহা হয়ে গিয়েছে···আমি আর ওদের মারকে ভয় করি না !

কেসী কি একটা পাতা নিয়ে এসে টমকাকার সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়ে দেয়, সারা রাত জেগে সেবা করে।

কিছুদিন পরে কেসী অত্যাচার আর সহ্য না করতে পেরে পালায়। লেগ্রির সকল রাগ গিয়ে পড়লো টমকাকার ওপর। সাম্বো কুইম্বোকে নিয়ে লেগ্রি টমকাকাকে জেরা করে, কেসী কোথায় ?

টমকাকা বলে, আমি জানি না !

লেগ্রি গর্জ্জন করে ওঠে, পাজী, শয়তান, যতক্ষণ না বলবি, ততক্ষণ এই চাবুকের···

সঙ্গে সঙ্গে সাম্বো আর কুইম্বোর চাবুক টমকাকার সর্ব্বাঙ্গে পড়ে।

লেগ্রি চীৎকার করে ওঠে, মেরে ফেল্ কুকুরটাকে !

টমকাকা যখন একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে গেল, তখন চাবুক থামলো।

অচৈতন্য হবার আগে বহুকষ্টে রক্তাক্ত হাতটা ওপরে তুলে টমকাকা প্রার্থনা করেন, ভগবান তুমি এদের ক্ষমা করো !

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে লেগ্রির আস্তানায় সম্ভ্রান্তবেশী এক তরুণ এসে উপস্থিত হলো। তরুণ নিজের পরিচয় দিয়ে বল্ল, আমার নাম জর্জ্জ সেলবী, আমার বাবার কাছ থেকে আপনি টম বলে একজন ক্রীতদাসকে কিনেছিলেন। আমি তার মুক্তির জন্যে টাকা নিয়ে এসেছি ! টমকাকা কোথায় ?

লেগ্রি অবজ্ঞাভরে বলে, ঐ কুলিদের লাইনে দেখুন···হয়ত এতক্ষণে টেঁসে গিয়েছে !

জর্জ্জ সেলবী চীৎকার করে কেঁদে ওঠে, না, না, তা কখনই হতে পারে না !

ছুটে কুলির লাইনে গিয়ে দেখে, সত্যই টমকাকার অন্তিম মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে আসছে।

টমকাকার মুখের কাছে গিয়ে জর্জ্জ সেলবী কাঁদতে কাঁদতে বলে, টমকাকা, টমকাকা, আমি এসেছি, তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে!

টমকাকা হেসে ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, আমি তো মুক্তি পেয়েছি বাবা···চল্লুম···যাবার সময় শুধু এই কথাই বলে যাই, যারা আঘাত দিলো, আমার দেবতা যেন তাদেরও করুণা করেন!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টমকাকার মৃত্যুহিম নিথর দেহ এলিয়ে পড়লো।

সেই পুণ্যদেহ স্পর্শ করে জর্জ্জ সেলবী প্রতিজ্ঞা করে, যারা আজ তোমার লোককে এই ভাবে মৃত্যু দিয়েছে, তাদের মৃত্যুর জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করলাম!

না ছুঁয়ে সম্মোহন

যাদুকর হিপ্‌নোটিষ্ট্‌, পিটার ক্যাসন্ কিছুমাত্র স্পর্শ না করেও যে কোন লোককে সম্মোহিত করতে পারেন।

সাধু রুইদাস

—শ্রীপ্রভাকর মা[illegible]

সাধু রুইদাস নগর-প্রান্তে কষ্টে কাটায় কাল,
মন্দা পড়িয়া কারবার তার হইয়াছে বান্‌চাল।
কে কিনিবে জুতা ? সারাদিন ঠায় বসে থাকে বাজারেতে,
সাঁঝে তা গোপনে রেখে আসে কোন ভক্তের উঠানেতে।
সব দিন হায় জুটেনা অন্ন—মুখে তবু মিঠা হাসি,
হরি-গুণ-গান করে রুইদাস নয়নের জলে ভাসি।
উপবাসী থাকে—ভিক্ষায় তবু যায় না সে কোন ঘরে,
পাছে বা অশুচি পরশ তাহার কাহারে মলিন করে!

তুষ্ট হইয়া সেবার একদা সন্ন্যাসী একজন
দিয়ে গেল তারে পরশমাণিক—সাত শ রাজার ধন।
দেখি ক্ষণকাল রুইদাস তাহা রাখিল বাতার পরে,
দীনের ঠাকুর ভুলাবে আমারে ?—আঁখিপাতা জলে ভরে।
কোন্ অপরাধ করেছি দেবতা, রাতুল চরণে তব ?
ধনৈশ্বর্য্যে ভুলাইতে চাও—একি লীলা অভিনব!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া লভিল শান্তি—কাজে দিল ফের মন,
দিনে দিনে তবু বাড়িছে দুঃখ—নাহি তার সমাপন।

গাছে গাছে পুনঃ কচি পাতা এলো—বছর ঘুরিয়া যায়,
সাধু রুইদাসে দেখিতে আসিল সন্ন্যাসী পুনরায়।
বর-বিস্ময়ে কহিল তাহার দীন-বেশ নিরখিয়া,
—এ কি রুইদাস! কি করিলে মোর পরশমাণিক নিয়া ?
মণির কথায় পরশমাণিক পড়ে গেল তার মনে,
বাতা হতে পাড়ি তাড়াতাড়ি তাহা ফিরে দিল মহাজনে।
কহিল কাতরে,—সন্ন্যাসীবর! লোভ দেখায়োনা আর,
দুঃখের মাঝে আশিস্ পেয়েছি দুঃখের দেবতার।

———

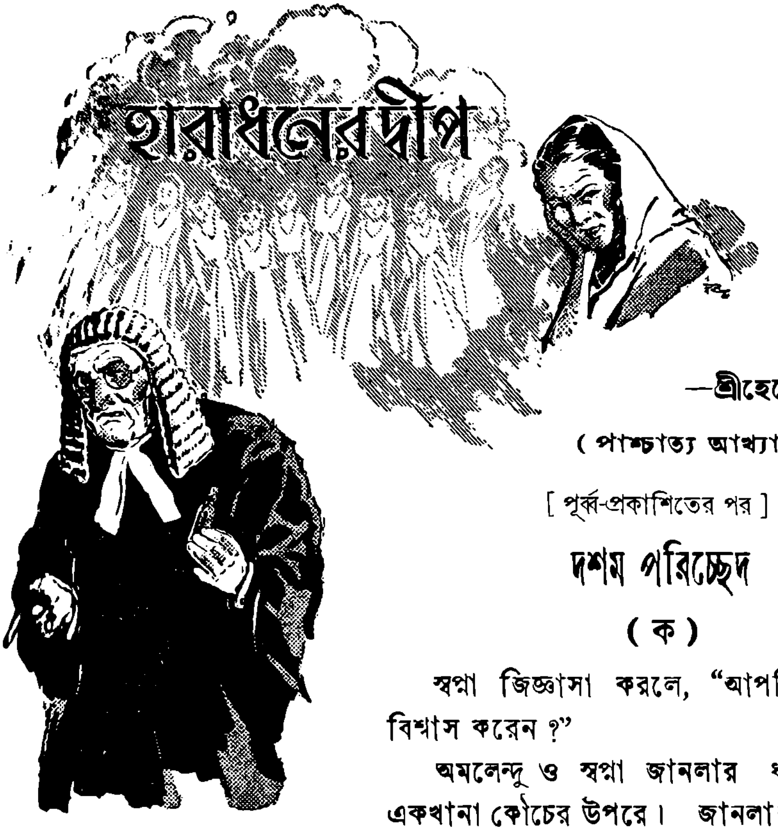

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(পাশ্চাত্য আখ্যান অবলম্বনে)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

দশম পরিচ্ছেদ

(ক)

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি এ-কথা বিশ্বাস করেন ?"

অমলেন্দু ও স্বপ্না জানলার ধারে বসেছিল একখানা কৌচের উপরে। জানলার সার্সি বন্ধ। বাইরে অশ্রান্তভাবে ঝরছিল বৃষ্টিধারা। ঝোড়ো হাওয়া উন্মত্তের মত গর্জ্জন করতে করতে আছড়ে প'ড়ে জানলার সার্সির উপরে মারছিল ধাক্কার পর ধাক্কা। দূরে দেখা যাচ্ছিল উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের উত্তেজিত নৃত্য।

অমলেন্দু বললে, "সমস্তই হচ্ছে অসম্ভব কাণ্ড! মেজর সেনের শোচনীয় মৃত্যুর পর একটা বিষয়ে নেই কোনোই সন্দেহ। দৈব-ঘটনা বা আত্মহত্যা, এসব হচ্ছে বাজে কথা। খুন, খুন! এখানে তিন-তিনটে লোককে নিশ্চয়ই খুন করা হয়েছে।"

স্বপ্না শিউরে উঠে বললে, "ওঃ, এ হচ্ছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন!"

অমলেন্দু গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ। আমরা সকলেই বাস করছি দুঃস্বপ্নের রাজ্যে। এর পরে অত্যন্ত সাবধান হয়ে আমাদের এখানে থাকতে হবে।"

স্বপ্না তার কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে বললে, "ওদের মধ্যে হত্যাকারী কে, আপনি কি তা অনুমান করতে পারেন ?"

অমলেন্দুর ওষ্ঠাধরে ফুটল মৃদু হাস্য। সে বললে, "ওদের মধ্যে? দেখছি ওদের দল থেকে আপনি আমাদের দু'জনকেই বাদ দিতে চান। অবশ্য, সেটা মন্দ কথা নয়। নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি আমি নই হত্যাকারী। আর মানুষ খুন করবার মত পাগলামি যে আপনার ভিতরেও আছে, এ-কথাও আমি মনে করি না।"

স্বপ্না হাসতে হাসতে বললে, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

অমলেন্দু বললে, "ঠিক ঐ কারণেই আপনিও কি আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারেন না?"

স্বপ্না একটু ইতস্তত ক'রে বললে, "আপনার মুখেই আমরা শুনেছি যে, সমস্যায় পড়লে আপনি একুশজন মানুষের মৃত্যুর জন্যেও দায়ী হ'তে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামোফোন রেকর্ডে যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, আপনাকে সেরকম লোক ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।"

অমলেন্দু বললে, "যথার্থ কথা। ধরুন, একজন কি দুইজন লোককে আমি হয়তো হত্যা করতে পারি। কিন্তু তারও একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। কেন আমি একটা-কি-দুটো নরহত্যা করব? নিশ্চয়ই কোনো লাভের লোভে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার বা আপনার কোনোই লাভের আশা নেই। সুতরাং ধ'রে নেওয়া যাক, আপনি বা আমি এই-সব খুনের জন্যে মোটেই দায়ী নই। তাহ'লে বাকি রইল আর পাঁচজন মাত্র লোক। তাদের মধ্যে হত্যাকারী কে? আমি যদি চন্দ্রবাবুকে সন্দেহ করি, তাহ'লে আপনি কি অত্যন্তই অবাক হবেন?"

স্বপ্না সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, "চন্দ্রবাবুকে সন্দেহ! কেন?"

—"কেন, তা ঠিক বলতে পারি না। তবে ভেবে দেখুন, তিনি হচ্ছেন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, আর বৎসরের পর বৎসর ধ'রে সর্ব্বশক্তিমান বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে আসছেন। নিজেকে মনে করেছেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁর একটি-মাত্র ইঙ্গিতেই যে-কোনো মানুষ ত্যাগ করতে পারে অন্তিম নিঃশ্বাস। বিচারকের আসন ছেড়ে আজ তিনি নেমে এসেছেন বটে, কিন্তু নিজের শক্তির দম্ভ আজও ভুলতে পারেন নি, কোনো মানুষকে আর প্রাণদণ্ড দেবার সুযোগ না পেয়েই হয়তো আজ তিনি পাগল হয়ে গেছেন!"

স্বপ্না আস্তে আস্তে বললে, "হয়তো সেটা অসম্ভব নয়।"

অমলেন্দু বললে, "আপনি কাকে সন্দেহ করেন?"

—"ডাক্তার বোসকে।"

—"ডাক্তারকে কেন?"

—"প্রথম দুই মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, বিষ। বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় ডাক্তারদেরই। এটাও মনে রাখবেন, ডাক্তার বোস ঘুমোবার ওষুধ ব'লে মালাকে কি-একটা পান করতে দিয়েছিলেন।"

—"হ্যাঁ, সে-কথা সত্য।"

—"তারপর ডাক্তার যখন মেজর সেনকে ডাকতে যাবার নাম ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল না।"

—"হয়তো আপনার এ-অনুমান যুক্তিহীন নয়।"

(খ)

ডাক্তার বোস অধীর কণ্ঠে বললেন, "আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে —যেমন ক'রে হোক্ বেরিয়ে পড়তেই হবে।"

চন্দ্রবাবু জানলার সার্সির ভিতর দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বৃষ্টিস্নাত অরণ্যের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতমুখে বললেন, "আবহাওয়া সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই, তবে আমার মনে হচ্ছে এই জল-ঝড় সম্ভবত আরো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে থামবে না। এমন দুর্য্যোগে কোনো নৌকোই এই দ্বীপের কাছে আসতে পারবে না।"

ডাক্তার প্রায় আর্ত্তস্বরে বললেন, "আর ইতিমধ্যে আমাদের সকলকেই একে একে প্রাণ দিতে হবে?"

চন্দ্রবাবু বললেন, "প্রাণ যে দিতেই হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। যে কোনো বিপদকে এড়াবার জন্যে আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছি।"

ডাক্তার বললেন, "কিন্তু মনে রাখবেন, এর মধ্যেই তিনজন হতভাগ্যকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।"

—"হ্যাঁ, আমি তা ভুলিনি। কিন্তু তারা কোনো বিপদের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। আমরা আগে থাকতেই সাবধান হয়ে আছি।"

ডাক্তার অসহায়ভাবে বললেন, "কিন্তু কি আমরা করতে পারি? আজই হোক্ আর কালই হোক্—" বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন। তারপর আবার বললেন, "এ-সব যে কোন্ পাষণ্ডের কীর্ত্তি, সে-কথা পর্য্যন্ত আমরা জানিনা।"

—"জানিনা নাকি?"

—"আপনি কি কারুকে সন্দেহ ক'রেছেন?"

—"অবশ্য আমার হাতে আসল প্রমাণ ব'লে কিছুই নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে একটা সিদ্ধান্তে আমি উপস্থিত হয়েছি। একজনের কথা আমার বারবার মনে পড়ছে।"

ডাক্তার হতভম্বের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কার কথা বলছেন ?"

কিন্তু চন্দ্রবাবু কোনো জবাব দেবার আগেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে অমলেন্দু ও মহেন্দ্র। এবং তারা আসন গ্রহণ করবার পরেই ঘরের ভিতরে হন্তদন্তের মত এসে দাঁড়াল নিত্যানন্দ।

সে বাধো-বাধো গলায় বললে, "আপনারা কিছু মনে করবেন না, কিন্তু কেউ কি বলতে পারেন, স্নানঘরের দরজার পর্দাখানা কোথায় গেল ?"

অমলেন্দু বললে, "স্নানঘরের দরজার পর্দা ? তুমি কি বলতে চাও ?"

—"পর্দাখানা আর খুঁজে পাচ্ছি না।"

চন্দ্রবাবু বললেন, "আজ সকালে সেখানা কি যথাস্থানেই ছিল ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

মহেন্দ্র বললে, "কি রকম পর্দা ?"

—"স্নানঘরের দেওয়াল আর মেজের রং লাল। তার সঙ্গেই মিলিয়ে দরজায় ঝোলানো ছিল একখানা লাল রঙের পর্দা।"

অমলেন্দু বললে, "পর্দাখানা তুমি আর খুঁজে পাচ্ছ না ?"

—"আজ্ঞে না।"

মহেন্দ্র শুকনো হাসি হেসে বললে, "পর্দাখানা তাহ'লে আপনাআপনিই অদৃশ্য হয়েছে ? কথাটা পাগলের প্রলাপের মতন শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু এ-হচ্ছে পাগলেরই বাড়ী। পর্দাখানা নেই ব'লে কোনো দরকার নেই আর মাথা ঘামাবার। তার কথা ভুলে যাও। একখানা লাল রঙের পর্দা দিয়ে কেউ কারুকে খুন করতে পারে না।"

আর কিছু না ব'লে নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের ভিতরে ব'সে প্রত্যেকেই তাকাতে লাগল প্রত্যেকের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

রাত্রে সবাই মৌনমুখে আহার করতে বসল।

বাইরের অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে মেঘের আর ঝড়ের গর্জন। ঘরের ভিতরে জ্বলছে বটে পেট্রলের সমুজ্জ্বল আলো, কিন্তু তবু চারিদিকে যেন ঘনিয়ে আছে একটা থম্‌থমে ভয়-ভয় ভাব!

অমলেন্দু হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললে, "উপরের তিনটে ঘরে রয়েছে তিনটে মৃতদেহ। সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হ'ল না।"

চন্দ্রবাবু বললেন, "এই দুর্য্যোগে সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই হ'তে পারে না। উপরন্তু যতক্ষণ আমরা বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করতে পারি, ততক্ষণ ঐ দেহগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যুক্তি-সঙ্গত নয়। আগে পুলিসে খবর দিতে হবে, তারপর অন্য কথা।"

সৌদামিনীর সঙ্গে স্বপ্নাও চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়ে বললে, "রাত বাড়ছে। আমরা এখন ঘুমোতে যাই।"

মহেন্দ্র বললে, "কিন্তু ঘুমোবার আগে কেউ যেন ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলবেন না।"

চন্দ্রবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমাদেরও ঘুমোবার সময় হয়েছে। চলুন সবাই, আশা করি কাল সকালে সকলেই 'সুপ্রভাত' ব'লে পরস্পরকে সম্বোধন করতে পারব।"

সকলের শেষে গাত্রোত্থান ক'রে মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। একবার ঘরের চারিদিকে বুলিয়ে নিলে তার অতি সতর্ক দৃষ্টি। তারপর নিজের মনে বিড়্-বিড় ক'রে বললে, "আজ আর কেউ বোধ হয় হারাধনের ছেলেদের নিয়ে টানাটানি করবে না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

(ক)

পরদিনের প্রভাত কাল। জল-ঝড়ের মাত্রা খানিক ক'মে এসেছে বটে, কিন্তু এখনো সূর্য্যহীন আকাশ হ'য়ে আছে মেঘে মেঘে মেঘময়।

বিছানা থেকে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে মহেন্দ্র ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, বেলা তখন সাড়ে সাতটা।

বাহির থেকে দরজায় করাঘাত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দুর গলায় শোনা গেল, "মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্রবাবু, এখনও ঘুমোচ্ছেন নাকি?"

মহেন্দ্র ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললে, "ব্যাপার কি, এত ডাকাডাকি কেন?"

অমলেন্দু বললে, "নিত্যানন্দ রোজ সকালে সাড়ে ছ'টার সময় আমাদের চা প্রস্তুত করে। কিন্তু আজ এখনও তার কোনো সাড়া বা পাত্তাই নেই। তার ঘরে গিয়েছিলুম, সেখানেও দেখতে পেলুম না তাকে।"

ইতিমধ্যে আর সকলেও নিজের নিজের ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

চন্দ্রবাবু বললেন, "নিত্যানন্দ রান্নাঘরে গিয়ে বোধ হয় আমাদের প্রাতরাশের আয়োজনে ব্যস্ত আছে। চলুন, দেখে আসি।"

সকলে নিচে নেমে এসে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে টেবিলের উপরে চায়ের কেট্‌লি, পেয়ালা ও খাবারের প্লেটগুলো সাজানো রয়েছে বটে, কিন্তু নিত্যানন্দ অদৃশ্য! এমন কি উনুনে আগুন পর্য্যন্ত জ্বলছে না! তারপর সকলে প্রবেশ করলে বৈঠকখানার মধ্যে। সে-ঘরও শূন্য।

হাতের মুঠোর ভিতরে তখনও একখানা কাটারি।

আচম্বিতে স্বপ্নার মুখে ফুটল অস্ফুট এক আর্ত্তস্বর! বিহ্বলের মত সে চন্দ্রবাবুর একখানা হাত সজোরে চেপে ব'লে উঠল, "দেখুন, দেখুন! টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখুন!"

টেবিলের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে আর একটা হারাধনের ছেলে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র ছয়টা পুতুল!

* * *

অল্পক্ষণ পরেই নিত্যানন্দের সন্ধান পাওয়া গেল। উঠানে নেমে উনুনে আগুন জ্বালাবার জন্যে সে জ্বালানি কাঠ কাটতে গিয়েছিল। সেইখানেই তার দেহটা মাটির উপরে প'ড়ে রয়েছে, হাতের মুঠোর ভিতরে তখনও সে চেপে ধ'রে আছে একখানা কাটারি!

তার কণ্ঠের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত এবং একটু তফাতে প'ড়ে রয়েছে একখানা রক্তাক্ত ভোজালি!

(খ)

ডাক্তার বললেন, "গলার পিছন দিকে আঘাতের চিহ্ন। নিত্যানন্দ যখন হেঁট হ'য়ে কাঠ কাটছিল, ঠিক সেই সময় নিশ্চয়ই কেউ এসে তাকে আক্রমণ করেছে।"

চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এভাবে অস্ত্রাঘাত করবার সময় কি খুব বেশী শক্তির দরকার হয়?"

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আপনি যা বলতে চান, বুঝেছি। হ্যাঁ, একাজ কোনো স্ত্রীলোকের দ্বারাও হ'তে পারে।" ব'লেই তিনি পিছন দিকে ফিরে তাকালেন। সৌদামিনী ও স্বপ্না সেখানে নেই। তারা তখন গিয়েছিল রান্নাঘরের ভিতরে।

ভোজালির হাতলটা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে মহেন্দ্র বললে, "উঁহু, আঙুলের দাগ নেই। হাতলটা যেন ভালো ক'রে মুছে ফেলা হয়েছে।"

হঠাৎ শোনা গেল খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাসির শব্দ; সবাই ফিরে দাঁড়াল সচকিতে। উঠানের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না। খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাসতে হাসতে থেমে থেমে সে বললে, "হারাধনের ছেলে, হারাধনের ছেলে! বলতে পারো হারাধনের ছেলেগুলো যায় কোথায়? হা, হা, হা!"

স্বপ্না কি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছে? সবাই ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

স্বপ্না ব'লে উঠল অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে:

"অমন ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে থেকো না! তোমরা কি ভাবছ আমি পাগল? আমি ঠিক কথাই বলছি। হারাধনের ছেলে, হারাধনের ছেলে! ও, তোমরা কি সেই ছেলে-ভুলানো ছড়াটা শোনোনি?—

'হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেল কাঠ,
একটি ম'ল দু'খান হয়ে—' হা, হা, হা!"

সে উদ্‌ভ্রান্তের মত হাসতেই লাগল!

ডাক্তার বললেন, "হিস্টিরিয়া, এ-যে স্পষ্ট হিস্টিরিয়ার লক্ষণ! সবুর করুন।"

তিনি স্বপ্নার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার গণ্ডদেশে করলেন সজোরে এক চপেটাঘাত! সে চম্‌কে উঠল, দু'একবার হেঁচকি তুললে এবং ঢোঁক গিললে। নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেক। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে, "আপনাকে ধন্যবাদ। এইবারে আমি সামলে নিয়েছি।"

তারপর সে আবার রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, "সৌদামিনী দেবী আর আমি চা-টা তৈরি করব। আমাদের দয়া ক'রে উনুনে আগুন দেবার জন্যে কিছু কাঠ এনে দিন।"

মহেন্দ্র বললে, "ডাক্তারবাবু, আপনার চিকিৎসা ফলপ্রদ হয়েছে।"

ডাক্তার কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "বাধ্য হ'য়েই আমাকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হ'ল। এত বিপদের ভিতরে আবার হিষ্টিরিয়া নিয়ে জড়িয়ে পড়া চলে না।"

অমলেন্দু বললে, "স্বপ্না দেবীকে দেখলে তো মনে হয় না ওঁর হিষ্টিরিয়া আছে।"

ডাক্তার বললেন, "না, না। স্বপ্না দেবী হচ্ছেন বুদ্ধিমতী আর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। কিন্তু এই আচমকা বিপদের ধাক্কা উনি সামলাতে পারেন নি।" (ক্রমশঃ)

ঘুম এসে যায় সম্মোহনে!

ঘুমুতে না পারলে যাদু-হিপ্‌নোটিষ্ট পিটার ক্যাসন্‌কে ডাকা উচিত। মাত্র আধ মিনিটেই পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নির্ব্বাক্!

ফিরে পাওয়া

—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত

> দৈব দুর্ঘটনার মাঝেই আসে বিরহ আর অশ্রু-বন্যা; আর কত দৈব-দুর্ঘটনার মাঝেই আসে পুনর্মিলন ও চাঁদের আলো।

বীরগঞ্জের বুড়োশিবের মন্দির।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে আজ সেখানে গাজনের মেলা। আশপাশের দশখানা গাঁ' যেন ভেঙ্গে পড়েছে! মেলার ভীড়ের চেয়ে মন্দিরেই লোক-সমাগম বেশী। বুড়োশিবের মাথায় জল ঢেলে, আর অনেকেই সেখানে মানত্ করে, আর যাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তারা আজকের দিনেই বুড়োশিবকে পূজো দিয়ে যায়। ভারী জাগ্রত দেবতা! কত দূর দূর দেশের লোক যে সেখানে আসে, তার ঠিক নেই।

বছর পাঁচেকের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে, কোন্ গেরস্থের একটি বৌ, মন্দির-চত্বরে উঠে, ভীড় ঠেলে ভিতরে যেতে না পেরে, ছেলেটাকে দালানের একপাশে নামিয়ে দিয়ে বল্লে—"এইখান্টিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকিস্ খোকা! আমি চট্ করে ঠাকুরকে পূজো দিয়ে আসি।—যাস্নি যেন কোথাও।"

অভাব-অনটনের সংসারে, স্বামী তার আজ পাঁচ মাস ধরে বাতে শয্যাশায়ী। মুখখানি তাই তার মলিন। ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সাত মাইল পথ ভেঙ্গে, সে বুড়োশিবের কাছে স্বামীর আরোগ্য-কামনায় মানত্ কত্তে এসেছে।

খোকার হাতে একটা কাঠের ঘোড়া। মেলায় এসে তার মা তাকে চার পয়সা দিয়ে কিনে দিয়েছে। মনটা তার খুশীর আলোয় জ্বল্জ্বল্ কচ্ছে। পূজোয় কেনা তার নতুন সাটিনের জামা এতদিন বাক্সে তোলা ছিল, আজ সে তা' পরতে পেয়েছে। ঝাঁক্ড়া-ঝাঁক্ড়া কালো চুলের মাঝে, পরীর মতো সুন্দর মুখখানিতে, তার ভাসা ভাসা চক্চকে চোখদুটি দিয়ে, মেলার হরেক রকম খেলার দিকে কৌতূহল-দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে। মা তার, ভীড় ঠেলে মন্দিরের সিং-দরজার দিকে তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

ভীড়ের ঠেলায় একটু একটু করে সরে সরে, খোকা কখন গাজনতলায় এসে পড়েছে, তা' সে একটুও বুঝতে পারেনি।

বেলা বাড়ে। খোকার খিদে পায়। মা কেন তবু এখনো আসে না? খোকা এদিক-ওদিক চারিদিকে চায়। এ কোথায় এলো সে? মা-তো তাকে এখানে রেখে যায়নি! চারিদিকেই লোকে-লোকারণ্য! চ্যাঁচামেচি—হৈ-হুল্লোড়্! বাঁশী, ভেঁপু, ঝুমঝুমি, পুতুল, রেউড়ী, চানাচুর, নকলদানা, কিছুই যে তার ভালো লাগছে না! তার মা কৈ?

চোখ ফেটে তার জল আস্ছে। চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু, মা-যে বলেছে—"খোকা, তুমি বড় হয়েছ না? ছিঃ! কাঁদতে নেই!" তাইতো সে কাঁদতে পাচ্ছে না।

সূয্যি ডুবুডুবু। সন্ধ্যে হয়ে আসে। আকুল হয়ে খোকা ছুটোছুটী করে সবার মুখের দিকে চেয়ে, তার মাকেই খালি খোঁজে।

ঐ তো! রাঙাপেড়ে শাড়ীপরা, তার দুষ্টু-মা, হাওয়া-গাড়ীর দিকে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে বুঝি তার খোকাকেই খুঁজতে!

"মা! মা!"—খোকাও ভীড় ঠেলে, হাওয়া-গাড়ীর দিকে, তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ছুটে চল্লো। হঠাৎ কার পায়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে, খোকা ছিট্‌কে পড়্‌লো, সেই রাঙাপাড় শাড়ীপরা মহিলার পায়ের তলায়।

"আহা! বাছা রে!" বলে, মহিলাটি তাকে ধূলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিলেন।

অনেকক্ষণ পরে, খোকা যেন তার মাকে পেয়ে, নিত্য সাঁঝে যেমন করে তার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে, তেম্‌নিভাবে তাঁকে জড়িয়ে, তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে 'মাগো!' বলেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলো।

গাড়ীর ভেতর থেকে প্রৌঢ় মতন এক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নেমে এসে, খোকার নেতিয়ে পড়া অবস্থা দেখে, মহিলার কোল থেকে নিজের কোলে নিয়ে, বেদনামাখা স্বরে বলে উঠ্‌লেন—"আহা-হা! বুকে বোধ হয় বড্ড লেগেছে! দেখ-দিকিন্‌ এর মায়ের আক্কেল! এম্‌নিভাবে এই ভীড়ের ভেতর কেউ এতটুকু ছেলেকে একলা ছেড়ে দেয়?"

মোটরখানা ঘিরে সমবেদনা দেখাতে, ভীড়ের ঘনত্ব বেড়েই চলে। কিন্তু ছেলেটার মা কিংবা তার কোন আপন জন তাকে নিতে এলো না। এদিকে—সাঁঝের আঁধার গাঢ় হয়ে আসে। ছেলেটার চিকিৎসাও দরকার। সহরে যেতে না পারলে ডাক্তার পাওয়া যাবে না।

কাজেই—মহিলাটিকে গাড়ীর ভেতর গিয়ে বস্‌তে বলে, নিজে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে মোটরে উঠে, ভীড়ের দিকে চেয়ে সবাইকে শুনিয়ে বল্লেন—"আমি একে নিয়ে সরকারী হাসপাতালে যাচ্ছি। যারই ছেলে হোক্‌, সে যেন সেখানে খোঁজ করে তার ছেলেকে নিয়ে আসে।"

ভীড় ঠেলে মোটরগাড়ী, ঘুমন্ত খোকাকে নিয়ে মেলাতলা পেরিয়ে গেল।

—দুই—

নবীনবাবু কল্‌কাতার মস্ত বড় ব্যবসাদার। সুন্দর সৌম্য তাঁর চেহারা, আর শান্ত-স্বভাবের সাথে মনটাও তাঁর মহত্ত্বে ভরা। বয়স তাঁর, প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু নিজের ছেলেপুলে নেই একটিও। তাই স্ত্রী মনোরমার ইচ্ছেতে বীরগঞ্জে এসেছিলেন বুড়োশিবের কাছে মানত্‌ কত্তে।

সহরের ডাক্তার যখন খোকাকে পরীক্ষা করে বল্লেন—"আঘাত তেমন বেশী নয়"—তখন, নবীনবাবু এই অজানা পরের ছেলেটিকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়লেন। মনোরমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"তাহলে এখন উপায়?"

খোকা তখন মনোরমাকে তেম্‌নি আঁকড়ে ধরে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তার কচিমুখখানির দিকে চেয়ে মনোরমার মনে যেন সত্যই আজ মাতৃত্ব জেগে উঠেছে! তাকে কোলের ভেতর আরো গাঢ়ভাবে টেনে নিয়ে বল্লেন—"জাগ্রত ঠাকুর, বাবা বুড়োশিবের দয়া। এ হয়তো তাঁরই দান!"

নবীনবাবু, খোকার সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে বল্লেন—"তাকি কখনো হয়! না-জানি এ কাদের ছেলে! তারা হয়তো এতক্ষণে কত খোঁজাখুঁজি কচ্ছে! তার চেয়ে—"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনোরমা বল্লেন—"হ্যাঁ, সেই ভালো। তার চেয়ে, কল্‌কাতায় গিয়ে না হয় সব রকম খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেই হবে। যার ছেলে, সে নিজেই এসে নিয়ে যাবে'খন্। এখন রাত হয়ে আস্‌ছে, বাড়ী ফেরা যাক্।"

ভোরবেলায়, সুকোমল শয্যায় ঘুম ভাঙ্‌তেই খোকা ডাকলে—"মা!"

—"এই যে বাবা!" বলে ছুটে এসে মনোরমা তাকে কোলে তুলে নেয়, তার দু'হাতে কত রকম খাবার! খোকা, ঘরের চারিদিকে দেখে, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হক্‌চকিয়ে গেল! এ কি সত্যি না স্বপ্ন?

খোকার স্তম্ভিত ভাব দেখে, মনোরমা তার দু' গালে চুমো দিয়ে বল্লেন—"কি ভাব্‌ছিস্ রে খোকা?"

খোকা সত্যিই অবাক্ হয়ে গেছে। তার চোখে আজ সবই নতুন, সবই যেন অচেনা ঠেকছে! খালি মায়ের এই ভালবাসাটাই যেন তার কাছে নিত্যকালের একমাত্র চেনা জিনিষ! মা তার দেখতে হয়েছে কত ভালো! গায়ে তার কত ভালো ভালো গয়না! অবাক্ হয়ে খোকা জিজ্ঞেস্ কল্লে—"বাবাকে ওষুধ দিয়েছেন শিবঠাকুর?"

খোকার প্রশ্নে, মনোরমা চট্ করে ব্যাপারটুকু বুঝে নিলে। কোন্ অভাগী তার রুগ্ন স্বামীর জন্যে ওষুধ নিতে এসেছিল বুঝি শিবের মন্দিরে। খোকার মনের সব সংশয় সরিয়ে দেবার জন্যে মনোরমা বল্লে—"সেই শিবঠাকুরের দয়াতেই তো আমাদের ঘরবাড়ী সব বদ্‌লে গেছে, আর বাবাও তোমার বেশ ভালো হয়ে উঠেছেন।"

খোকার মনে পড়ে—মায়ের মুখে শোনা, শিবঠাকুরের অসীম দয়ার কত গল্প! অবাক হয়ে থাকে সে।

খোকাকে নিয়ে মনোরমাকে তন্ময় দেখে নবীনবাবু ঘরে ঢুকেই বল্লেন—"গোমস্তাকে বলে দিলাম, যে-যে খবরের কাগজে আমার নতুন দোকানের জন্যে বাঙলা হিসাব-জানা কর্ম্মচারী আবশ্যকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, যেন সেই সেই কাগজে, খোকার হারিয়ে যাওয়ার—"

তাঁর মুখের কথায় বাধা দিয়ে মনোরমা বল্লেন—"না, না, তাকে বারণ করে দাওগে, এ বিজ্ঞাপন দেবার কোন দরকার নেই। নাও এখন বসো দেখি একটু খোকার কাছে। আমি দেখি, কি ওর দুধটা গরম করে আন্‌তে এত দেরী কচ্ছে কেন?"

নবীনবাবু হাত বাড়িয়ে খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে, অনেকদিন পরে খোকা যেন তার বাবার কোলে চড়তে পেয়ে ধন্য হলো!

—তিন—

বীরগঞ্জের সাত মাইল দূরে রতনপুরের ছোট্ট কুঁড়েখানিতে, খোকাকে হারিয়ে, শূন্যমনে ফিরে খোকার মা আছ্‌ড়ে পড়্‌লো। পাড়া-পড়্‌শীরা সান্ত্বনা দিলে—"বুড়োশিবের দয়ায় খোকাকে তুমি ফিরে পাবে নিশ্চয়।"

ভীড়ের মধ্যে খোকা হারিয়ে গেছে শুনে, বাতে পঙ্গু হরিহরের বুকে মোচড় দিয়ে, চোখে এলো

জলের ধারা। ছুটে গিয়ে, মেলার ভীড় তোলপাড় করে খোকাকে খুঁজে আন্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লেও, সে-যে আজ বড়ই নিরুপায়! যাহোক্, কাল সকালেই কেউ দয়া করে খোকাকে হয় তো ফিরিয়ে দিয়ে যাবে নিশ্চয়।"—নিজের মনকে আর খোকার মা-কে সেই কথা বলেই প্রবোধ দিলে।

এক এক করে, একশোর ওপর আরো একশো সকাল হলো, কিন্তু খোকা তো কৈ ফিরলো না! বুড়োশিবের দয়ায় হরিহর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো! সংসারের দারুণ অভাব অনটন, এইবার যেন তার সাম্‌নে মূর্ত্তিমন্ত হয়ে ফুটে উঠলো!

একদিন সে তাই খোকার মাকে বল্লে—"এইবার তোমাকে কিছুদিন, এখানে একলা থাক্‌তে হবে। আমি কালই আবার কল্‌কাতায় যাবো ঠিক্ করেছি। পুরাণো চাক্‌রীটা পাই তো ভালই, না হলে, যাহোক্ একটা খুঁজে পেতে নিতে হবে। এ অজন্মার বছরে, সামান্য ক্ষেত-খামারের ভরসায় গাঁয়ে পড়ে থাক্‌লে, রোগের দেনা তো শুধ্‌তেই পারবো না, শেষটা হয়তো না খেতে পেয়ে মরতে হবে। তাছাড়া, হাসপাতালের ডাক্তারবাবু যা বল্লেন—তাতে আমার মনে হয়, খোকা নিশ্চয় কল্‌কাতাতেই আছে।"

শেষসম্বল হাতে করে হরিহর কল্‌কাতায় রওনা হয়েছে, তা-ও আজ প্রায় ছ'মাস হলো। মাঝে দু'একখানি চিঠি আর টাকাও এসেছে খোকার মায়ের নামে দু'মাস আগে। তারপর আরও দু'মাস হতে চল্লো, হরিহরের চিঠিপত্তর বা কোন খোঁজ-খবর নেই। মাঝে, কলকাতায় হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। স্বাধীন ভারত হয়েছে দু'দলে ভাগাভাগি। পঞ্চাশ মাইলের তফাতে থেকেও সেখান থেকে টাকাকড়ি আর চিঠিপত্তর আসায় হয়েছে বেজায় কড়াকড়ি। এদিকে —গাঁয়েও আর থাকা যায় না। সুখ-শান্তি তো গেছেই, এখন একমুঠো অন্ন জোটা ভার। তার-ওপর সাম্প্রদায়িক দুর্নীতির প্রশ্রয় পেয়ে, গুণ্ডাদলের বুকের বল গেছে হাজার গুণ বেড়ে।

এই রকম সময়ে, একদিন সকালে, সব পড়্‌শীদের সাথে মিলে, চোখের জল বুকে চেপে, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে খালি হাতেই, খোকার মা একলা, বাস্তুহারাদের দলে মিশে পড়ে, 'মহানগরী রাজধানী'তে এসে পৌছুলো। হরিহরের ঠিকানা সে জান্‌তো না। জান্‌লেও, এ কোলাহলে ভরা জনারণ্যে তাকে খুঁজে দেবে কে? কে জানে, সে আজ বেঁচে আছে কি-না?

* * * * * * *

পাঁচটি বছর প্রায় কেটে আসে, হরিহর এখন তার নতুন মনিবের কারবারে হিসাবের খাতাপত্র ঠিক রাখায়, বেশ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলে নাম করেছে। মাইনেও বেড়েছে তার অনেক, হাতেও টাকা জমেছে কিছু। ক'বার সে 'মনি-অর্ডার' করে টাকা পাঠিয়েছিল, কিন্তু ফিরে এসেছে। কিছুদিন আগে একবার রতনপুরে তার দেশেও গিয়েছিল সে; খোকার মাকে নিজের কর্ম্মস্থানে এনে, বাসা ভাড়া করে আবার সংসারী হবে বলে।—কিন্তু, ভাঙ্গাবাড়ী আর পরিচিত পড়্‌শীশূন্য পাড়া দেখে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে সে। খোকাকে আর খোকার মাকে নিয়ে তার ছোট্ট শান্তির সংসারটুকুর কথা সদাই তার মনে পড়ে। ঘাড় ঝুঁকিয়ে সে মনিবের হিসেবের খাতায় মগ্ন হয়ে যায়। মনটা যখন তার ভীষণ হু-হু করে ওঠে, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে—"হে দয়াল ঠাকুর! দয়া করে তুমি আমায় স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছ। তুমিই আবার দয়া করে আমায় সুখ-শান্তি ফিরিয়ে দাও!"

পুরুত্‌ঠাকুরের দয়ায় এখন সে কালী-বাড়ীর ঝি। মন্দিরের দালান ধোয়া-মোছা, পূজোর বাসন-কোশন পরিষ্কার করা, পূজার্থী অতিথ্‌-অভ্যাগতদের সেবা-পরিচর্য্যা নিয়েই দুঃখ-কষ্টে খোকার মায়ের দিন কাটে।

দুপুর বেলাটা কোন কাজকর্ম্ম থাকে না। একা একা খোকার মায়ের দিন যেন আর কাট্‌তে চায় না! ঠাকুরবাড়ীর রোয়াকে বসে খোকার মা, রাস্তার দিকে চেয়ে পথের ভীড়ে কি যেন খোঁজে!

সাম্‌নেই এক মস্ত ইস্কুল। কত ছেলে! মায়ের মন্দিরে তারাও প্রণাম করতে আসে। খোকার মা তাদের হাতে মায়ের প্রসাদী ফুল-বেলপাতা সিঁদূর-চরণামৃতের সঙ্গে পূজোয় পাওয়া সন্দেশ-বাতাসার টুক্‌রো দিয়ে তাদের চাঁদমুখের হাসি-খুসী ভাবটি মন ভরে উপভোগ করে।

সব ছেলে নিত্য আসে না। কিন্তু একটি ছেলে আসে ঠিক্‌ নিয়ম করে। মন্দির-চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে, সে ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করে যায়। ঝি তাকে বেশী করে তার হাতে প্রসাদী সন্দেশ গুঁজে দেয়। খুসী-ভরা চোখে ছেলেটি তার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকে। ছেলেটি চলে গেলে তার বুক ঠেলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

খোকা ইস্কুল থেকে আজ বাড়ী ফিরে গিয়ে তার মায়ের কাছে আব্দার ধরেছে—"তুমি তো মা, কোথাও যেতেই চাও না। নইলে—এখান থেকে আমাদের ইস্কুল আর কতটুকুই বা! সাম্‌নেই তো ঐ মন্দির! তুমি নিজের হাতেই তো দিতে পারতে! বলো মা, তুমি নিশ্চয় দেবে? —নাই-বা হলো সে আমার কেউ। ভিখিরীও নয় আর আমার কাছে চায়ওনি সে, তা জানি। কিন্তু তার লালপেড়ে শাড়ীখানা যে বড্ড ছিঁড়ে গেছে! কতগুলো তালি বসিয়েছে মা তাতে, তবু সেই লালপেড়ে শাড়ীখানা পরলেই তাকে বেশ দেখায় মা! মাথার সিঁথিতে তার চওড়া করে অনেক লাল সিঁদূর! কি যে সুন্দর তাকে মানায় মা! দেবে তো মা তুমি, তোমার ঐ লালপেড়ে পুরোণো শাড়ীখানা?—কাল ইস্কুলে যাবার সময়, আমি আমার বইয়ের ব্যাগের মধ্যে করে লুকিয়ে নিয়ে যাবো, কেউ দেখ্‌তে পাবে না। তারপর ছুটির পর, মন্দিরে প্রণাম করলে যখন সে আমায় প্রসাদ দেবে, তখন কাপড়খানা তাকে দিয়ে বল্‌বো—আমার মা দিয়েছেন।"

—"আহা-হা! গেল, গেল!" [পৃঃ ৫৩৩

মনোরমাকে রাজী হতেই হলো। খোকা খুশী হয়ে খেল্তে গেল।

তার পরদিন।—ইস্কুলের ছুটির পর—সব ছেলেরা হল্লা করে যে-যার বাড়ীর পথে এগিয়ে গেছে—অনেক দূর। হাতে, মায়ের প্রসাদী সন্দেশ নিয়ে, মন্দিরের সিঁড়িতে দুই চোখে আকুল দৃষ্টি দিয়ে ঝি দাঁড়িয়ে আছে খোকার আশায়।

ঐতো! ওদিকের ফুটপাথে—হাসিমুখে খোকা এদিকেই এগিয়ে আসে!—ব্যাগ থেকে বার করে এক লালপেড়ে শাড়ী!—রাস্তাটুকু পেরিয়ে আস্তে তার যেন আর তর সয় না!—

—"আহা-হা! গেল, গেল!"

খোকার রক্তাক্ত দেহটা, ফুটপাথের তলায় ছিট্‌কে পড়্‌লো। —মিলিটারী লরীখানার তীব্রগতি খানিকদূরে গিয়েই ঘ্যাস্ করে থেমে গেল।

—"হে, মা কালী! এ কী কল্লে মা?"

রাস্তা পেরিয়ে ছুটে এসে, খোকার রক্তমাখা মূর্চ্ছিত শরীরটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে কালী-বাড়ীর ঝি-ও জ্ঞান হারালো।

—চার—

হাসপাতাল থেকে তাঁর অফিসে 'ফোন' পেয়েই নবীনবাবুর সর্ব্বশরীর থর্‌থরিয়ে কেঁপে উঠ্‌লো। পাঁচটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।—সব কর্ম্মচারীই চলে গেছে। কেবল হরিহর তখনও ঘাড় গুঁজে তার দৈনিক আয়-ব্যয়ের পাতায় যোগ-বিয়োগ কসে চলেছে।

নবীনবাবুর হাত থেকে ফোনের রিসিভারটা ঝপ্ করে পড়ে গেল। কাঁপা গলায় তিনি হরিহরের দিকে চেয়ে বল্লেন—"আমার গাড়ীখানা নিয়ে শীগগির তুমি বাড়ী যাও হরিহর! সেখান থেকে মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের 'য়্যাক্‌সিডেন্ট্-ডিপার্টমেণ্টে' চট্ করে চলে এসো। আমি এদিক থেকে ট্যাক্সিতে করে হাসপাতালে চল্লুম।—খোকা মোটর চাপা পড়েছে।"

তিনি আর দাঁড়ালেন না। ঝড়ের বেগে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

হরিহর হতভম্বের মতো নির্ব্বাকভাবেই, খাতাপত্র বন্ধ করে প্রভুর আদেশ পালন করতে ছুটলো।

হাসপাতালের কেবিনে—ঝিয়ের কোলে খোকা। মাথায় আর পায়ে তার 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধা হয়ে গেছে। আঘাত খুবই গুরুতর! তবু ডাক্তারবাবু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বল্লেন—"ভয় নেই। ভালো হয়ে যাবে।—তোমারই ছেলে বুঝি?"

—"এখন তো আমার তাই মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু! ওর তিন বছর বয়সের সময় খোকার বুকে একটা ফোড়া হয়ে যে 'অপারেশন্' হয়েছিল, তার দাগ এখনো তো মিলিয়ে যায়নি।—সেই দাগ দেখেই আমি চিনেছি—এ ছেলে আমারই।"

নবীনবাবু কখন সেখানে এসে উদ্বিগ্নমনে একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে খোকার দিকে অপলক-দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। এমন সময় মনোরমা আর হরিহরও সেখানে এসে পৌছুলো।

ভয়কাতর ব্যাকুলস্বরে মনোরমা সেখানে ঢুকেই একেবারে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ডুক্‌রে উঠ্‌লেন— "খোকা!—খোকারে আমার!—"

—"না না, আমার খোকা!" কালীবাড়ীর ঝি, আরো নিবিড়ভাবে খোকাকে তার বুকে ধরে।

হরিহর বিস্ময়ে একেবারে দিশাহারা! এ কি! এতদিন পরে, তার খোকা সত্যিই যে ... কোলে!

নবীনবাবুর চোখে বিস্ময়, ঠোঁটে তার পরমতৃপ্তির মধুর হাসি। মনোরমা তাঁর মুখের দিকে ..., অন্তরের সমস্ত আকুলতা উজাড় করে বলে উঠ্‌লেন—"কিন্তু, আমি যে ওকে আজ পাঁচটি বছর ..."

কালীবাড়ীর ঝি, ব্যাপারটা সব বুঝ্‌তে পেরে, সকলের মুখের দিকে চেয়ে পরম-পরিতৃপ্তির আনন্দে পূর্ণ হয়ে বল্লে—"সত্যি দিদি, আমি ওকে পেটে ধরে, তারপর পাঁচটি বছর ধরে মানুষ করে, আবার তার পরেও, কি করে যে আর পাঁচটি বছর কাটাচ্ছি, তা' জানেন শুধু মা-কালী আর—"

এতক্ষণে—নবীনবাবু সব ঘটনাসূত্র এক করে ব্যাপারটার সবই বুঝ্‌তে পারলেন। তাই হরিহরের ... চেয়ে শান্তস্বরে বল্লেন—"সব কথা তুমি তো আমাকে কোন দিনই খুলে বলোনি হরিহর! ... আর চুপ্ করে থাকা চল্‌বে না। দেখ্‌ছো তো, দুটি মায়ের একটি খোকা! আমার ব্যবসায়ের ... সম্পদে, তোমার অক্লান্ত আর অকৃত্রিম পরিশ্রমের দানও কিছু কম নয়—আজ থেকে তুমি তার ... অংশীদার। আর তোমার-আমার পরে, ঐ দুই মায়ের এক খোকাই হবে, আমাদের কারবারের ... মালিক।—এসো, সবাই মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—দুই মায়ের কোলে, ওদের স্নেহে ... সেবা-যত্নে খোকা ভালো হয়ে উঠুক। তারপর আমাদের মিলিত চেষ্টায়, খোকা যেন সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠে, দশের মাঝে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে।"

—খোকা চোখ মেলেছে।—তার মুখে হাসি! আর সবার চোখে তখন আনন্দের অশ্রুধারা!

বিনা যন্ত্রে ঐক্যতান

যন্ত্র নেই, কিছু নেই, তবু সবাই অর্কেষ্ট্রা বাজিয়ে চলছে বিশ্বের অতুলন হিপ্‌নোটিষ্ট, পিটার ক্যাসনের যাদুমন্ত্রে!

ড্যাম্ কুড়্কুড়

—শ্রীসুধীরকুমার রায়

ঢাকের বাদ্যি পূজোবাড়ী,
কাজটি সারো তাড়াতাড়ি।
জড়িয়ে শাড়ি কোমর ঘিরে,
ঐ তো 'কেকা' যাচ্ছে ধীরে।
শিউলি ফুলের নিয়ে ডালি,
পিছন ফিরে দেখছে খালি।
হাত দুটিতে রাঙা চুড়ি
মিলবেনা তো তাহার জুড়ি!
মনে আজি আমোদ ভারি,
যাচ্ছে 'কেকা' পূজোবাড়ী।

নেমন্তন্নের ভারি ঘটা,
বিজলি আলোর রঙীন ছটা—
চোখ-মুখেতে আমোদ ঝরে,
মা এসেছে মোদের ঘরে।
মিঠাই-মণ্ডার ছড়াছড়ি,
ছেলে-বুড়োর কাড়াকাড়ি।
ভিখারীটা করুণ স্বরে—
ভিখ্ চাইছে দাঁড়িয়ে দূরে,
ছোট্ট ছেলের মিঠাই নিয়ে,
চিল পালালো ঝাপ্টা দিয়ে।

নীল আকাশে পাল্‌টি তুলে,
মেঘ-পরীরা চল্‌ছে দুলে।
মুচকি হেসে ছড়িয়ে বারি,
স্ফূর্তি তারা করছে ভারি।
কাশফুলেরা দুলিয়ে মাথা,
বল্‌ছে যেন কিসব কথা!
পূজোয় এবার বেজায় ধুম,
খোকা-খুকুর নেইকো ঘুম।
মাতলো তারা পূজোর কাজে,
ঢ্যাম্ কুড়্‌কুড়্ বাদ্যি বাজে।

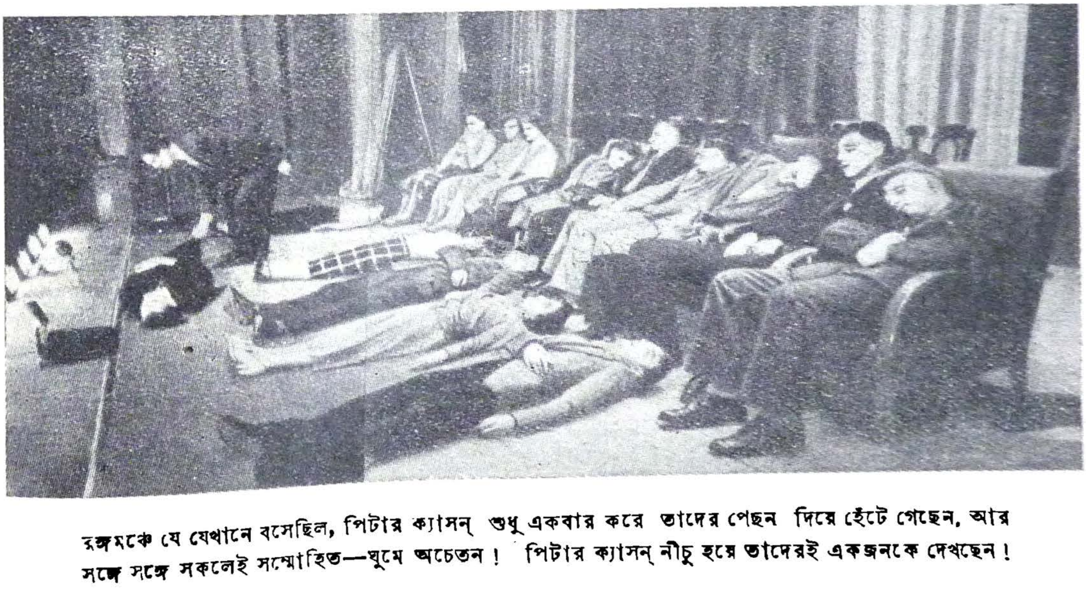

রঙ্গমঞ্চে যে যেখানে বসেছিল, পিটার ক্যাসন্ শুধু একবার করে তাদের পেছন দিয়ে হেঁটে গেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সম্মোহিত—ঘুমে অচেতন! পিটার ক্যাসন্ নীচু হয়ে তাদেরই একজনকে দেখছেন!

সবুজ শার্ট

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চুরি ও খুন হয়েছে! অপরাধী কে? তারই অনুসন্ধান করতে গিয়ে কত নতুন আবিষ্কার চোখের ওপর ভেসে ওঠে ছায়া-ছবির দৃশ্যের মত।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো প্রচণ্ডভাবে। ডাঃ কার্ক তখন অতি সূক্ষ্ম একখণ্ড ধাতু তাঁর নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রে ওজন করে পরীক্ষা করছিলেন। টেলিফোনের আওয়াজে কিছু বিরক্ত হয়ে তিনি রিসিভার তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন, "হ্যালো! কে? কি চাই?"

—"ডাঃ কার্ক আছেন? ডাঃ কার্ক?"

—"হ্যাঁ, আমি ডাঃ কার্ক। বলুন কি চাই? কে আপনি?"

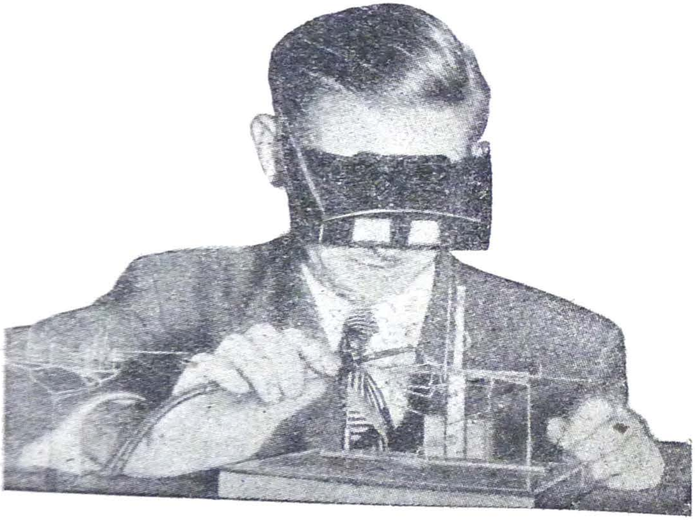

ডাঃ কার্ক তাঁর নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রে সূক্ষ্ম ধাতু ওজন করছেন।

সাড়া পাওয়া গেলো অপর প্রান্ত হতে। তাতে জানা গেলো, পুলিশের বড় সাহেব তাঁর অনুসন্ধান করছেন। তার কারণটা হচ্ছে এই।—

এক ধনী গেরস্তের বাড়ীর জানালার কাঁচ ভেঙে নাকি কে বা কারা প্রবেশ করেছিল! তারপর গৃহ-স্বামীকে ছোরার সাহায্যে হত্যা করে, তার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে হত্যাকারী পালিয়ে যায়। সন্দেহ করে দুটো লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তারা দু'জনাই বা তাদেরই কেউ, প্রকৃতই অপরাধী কি না, অথবা তারা একবারেই নির্দ্দোষ, তা সঠিক বলা যায় না। কাজেই ডাঃ কার্কের সাহায্যের প্রয়োজন।

নিহত ভদ্রলোকের গায়ে ছিল ব্রাউণ কোট; আর সন্দেহ বশে যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের একজনার গায়ে লাল কোট ও অপরের গায়ে ছিল সবুজ শার্ট। পরীক্ষার জন্য এই তিনটি জামাই ডাঃ কার্কের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ডাঃ পল্ এল্. কার্ক একজন অধ্যাপক,—আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রির অধ্যাপক। এ ছাড়া তাঁর আরও একটা বাই আছে। সে হচ্ছে নিজের চেষ্টায় তিনি অপরাধ-তত্ত্ব সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন, ও দিন-রাত এখনো সে বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ কাজটা তাঁর সখের কাজ, এটা তাঁর পেশা নয়। কিন্তু তাহলেও এই অপরাধ-তত্ত্ব গবেষণায় তিনি এম্নিধারা সুনাম অর্জ্জন করেছেন যে, এখন আমেরিকার পুলিশ-বিভাগও তাঁকে সমীহ করে চলে ও অনেক সময় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে। অপরাধ-তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা করবার জন্য তিনি নিজের হাতে অনেক যন্ত্রপাতিও তৈরী করে নিয়েছেন। মোট কথা, এ বিষয়ে তাঁর সুনামের জন্য আমেরিকায় তিনি এখন গণ্য-মান্য ব্যক্তি, আর এখন তাঁর এক মুহূর্ত্তের অবসরও নেই, তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য এখন অনেকেরই প্রয়োজন।

ডাঃ কার্কের ল্যাবরেটরী নানা যন্ত্রপাতিতে ভরপূর। তিনি জামা তিনটি নিয়ে তাঁর ঐ ল্যাবরেটরীতে গিয়ে বসলেন।

তিনি খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন গভীর ভাবে। তারপর তাঁর 'ভ্যাকুয়াম্ ক্লিনার' যন্ত্র দিয়ে তিনি একে একে তিনটি জামা হতেই ধূলো-বালি ইত্যাদি সূক্ষ্ম জিনিষ ঝেড়ে ফেলতে সুরু করলেন।

ডাঃ কার্ক ও তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র—'ভ্যাকুয়াম্ ক্লিনার'।

নিহত ব্যক্তির ব্রাউণ কোট থেকে বেরুলো ধূলো-বালি, ব্রাউণ উলের কুঁচো ও অতি সূক্ষ্ম সবুজ রঙা সূতোর আঁশ। লাল কোট পরীক্ষা করে পাওয়া গেল ধূলো-বালি ও তামাক-কুচির অতি সূক্ষ্ম অংশ। সবুজ শার্ট পরীক্ষা করে পাওয়া গেল, সবুজ সূতোর আঁশ, ধূলো-বালি ও ব্রাউণ উলের কুঁচো।

ডাঃ কার্ক তাঁর মন্তব্য লিখলেনঃ "সবুজ শার্ট যে আসামীর গায়ে, সে লোকই হচ্ছে প্রকৃত হত্যাকারী। কারণ, দেখা যাচ্ছে, সে ব্রাউণ কোটের সংস্পর্শে আসার

ফলে, তাঁর ব্রাউণ উলের কুঁচোকাঁচি তার জামায় লেগে রয়েছে। নিহত ব্যক্তির কোটেও ঠিক সেই একই কারণে সবুজ সূতোর আঁশ পাওয়া গেছে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, হত্যাকারী—সবুজ শার্টধারী লোক।

লাল কোট যার, সে নির্দ্দোষ। সে সম্ভবতঃ কোন সিগারেট-কারখানায় কাজ করে, তার জামার ওপর কাজেই এত তামাক-কুচি।”

তদন্তের ফলে প্রকাশ পেলো, লাল কোটধারী লোকটির সম্বন্ধে ডাঃ কার্ক যা লিখেছেন, সে কথা খুবই সত্যি।

এরপর একমাত্র সবুজ শার্টের মালিককেই বিচারের জন্য হাজতে আটকে রাখা হলো।

মাত্র দু'দিন পরে।

পুলিশ-অফিসে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। সবুজ শার্টধারী আসামী কেমন করে হাজত থেকে পালিয়েছে! অফিস থেকে তক্ষুণি যন্ত্র-সাহায্যে এখানে-সেখানে আদেশ প্রচারিত হতে লাগলো, আর দূর থেকে প্রেরিত সেই আদেশ (Remote-control Dictation) বিভিন্ন অফিসের সেক্রেটারীরা আনন্দে লিখে নিতে সুরু করলেন।

যন্ত্র-সাহায্যে নানাস্থানে আদেশ পাঠানো হচ্ছে।

আসামীকে খুঁজে বার করতে হবে, সংক্ষেপে এই হলো আদেশ। পুলিশ ছুটলো চতুর্দ্দিকে।

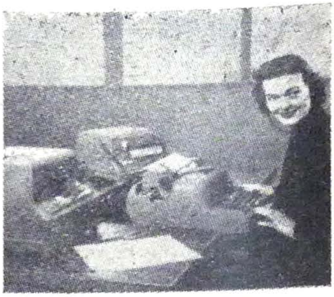

দূরবর্ত্তী অফিসের সেক্রেটারী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ লিখে নিচ্ছেন।

নদীর ধারে কতকগুলি লোক Log rolling বা গুঁড়ি-খেলা খেলছিল। ফাঁপা গুঁড়ি, তা জলে ভাসিয়ে তার ওপর হেলে-দুলে নেচে কত লোক খেলা করে! আমেরিকার অধিবাসীদের এ বড় মজার খেলা।

পুলিশ দেখলো, আসামীর যে বর্ণনা বেরিয়েছে, ওদের একটা লোকের চেহারা যেন সেই রকম! কিন্তু তাহলেও গ্রেপ্তার করবে কেমন করে? আসামী আছে অনেক দূরে—নদীর বুকে, আর সে আছে ডাঙায়।

বেতারে খবর পাঠালো সে, এরোপ্লেন পাঠাও। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সেপাই একবারও ভাবলো না, প্লেন তো কত রকম আছে! কোন্ প্লেন্ তার চাই, এবং কেন?

প্লেন যখন এসে গেলো, তখন আর সে খেলার কোন চিহ্নই সেখানে ছিল না ; খেলোয়াড়রা তাদের সেই খেলার জিনিষ নিয়ে নদীর অন্য তীরে অন্তর্হিত হয়ে গেছে ! কাজেই প্লেন ফিরে চললো কোন সন্ধান না পেয়েই।

কিন্তু সে প্লেন ছিল চুম্বকযুক্ত প্লেন (Magnetic plane)। ঝড়-ঝঞ্ঝা বা লড়ায়ের ফলে, কত সময় কত জাহাজ সাগর-তলায় তলিয়ে যায় ; এম্‌নি ধারা চুম্বক-প্লেন দিয়েই তাদের অনুসন্ধান করা হয়।

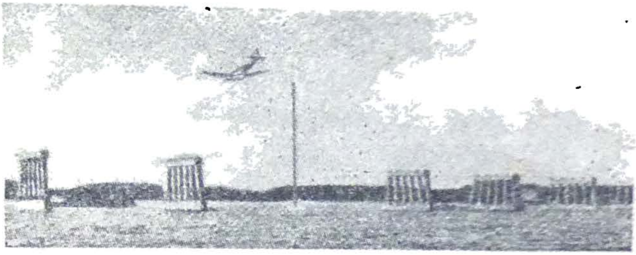

কোথায় কোন্ ডোবা জাহাজ, চুম্বক-প্লেন তা অনুভব করে।

ফিরে যাওয়ার সময় প্লেনের পাইলটের মনে হলো অতল জলের তলায় কোথায় যেন কিসের আকর্ষণ সে অনুভব করছে !

বটে ? তক্ষুণি সে তার প্রাথমিক কাজ সুরু করে দিল। আর তার ফলে, কয়েক দিনের মধ্যেই তলিয়ে-যাওয়া মাল-বোঝাই এক বিরাট জাহাজ বেরিয়ে পড়লো !

কিন্তু সেই সবুজ শার্ট ? তখনো সেই আসামীর আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

খাদ্য ছাড়াই ভোজ !

"খাও, খাও, খুব খাও।" এক পয়সা খরচা নেই, কাল্পনিক গ্লাস থেকেই মদ খাওয়ার হুল্লোড় চলেছে ! পিটার ক্যাসনের সম্মোহন-শক্তি সত্যই অতুলন !

সি. আই. ডি.

—সন্তোষকুমার দাস

দিনরাত ডিটেক্‌টিভ্‌-কাহিনী যারা পড়ে, তাদেরও অনেকেই হতে চায় ডিটেক্‌টিভ্‌ শার্লক হোম্‌স্‌! তেম্‌নি এক তরুণ কিশোর বাস্তবে যা রূপায়িত করে তুলেছিল, এই উপভোগ্য কাহিনী তারই এক আক্ষরিক ছায়াচিত্র মাত্র!

মুস্কিলে পড়েছে আমাদের স্মরজিৎ ওরফে শ্রীমান্‌ গণেশ।

একটা-আধটা ডিটেক্‌টিভ্‌ বই পড়তে তার ভাল লাগে—তাই বলে তাকে মার খেতে হবে? কেন? ডিটেক্‌টিভ্‌ বই পড়াও ত' পড়া—তবে?

আচ্ছা, এম্‌নি সব বই পড়তে পড়তে সেও ত' একদিন ডিটেক্‌টিভ্‌ হ'তে পারে। ধর—তার দাদার কলমটা চুরি গেছে—কিছুতেই চোর ধরা যাচ্ছে না! সে ত' ভাব্‌তে পারে: আচ্ছা, দাদা সবুজ কালীতে লিখত! দেখা যাক্‌ আরো ক'জনা সবুজ কালীতে লেখে!

সে তক্ষুণি একটা বিজ্ঞাপন দিলে, "৫০০৲ টাকার একটি কর্ম্মখালি আছে—স্বহস্তে লিখিয়া আবেদন করুন।"

ব্যস্‌, অমনই হুড়্‌ হুড়্‌ করে চিঠিপত্র এসে পৌছাল। তার মধ্যে ধর সবুজ কালীর লেখা মাত্র পাঁচটা। তাই বলে শ্রীমান্‌ গণেশ যে মনে করবে, যে পাঁচজনে মিলে কলমটি চুরি করেছে, এত বোকা সে নয়। এখন এই পাঁচটি চিঠির একটা এসেছে ধর বোম্বাই থেকে, একটি মাদ্রাজ, একটি কোরিয়া, আর একটি বুয়োনেস্‌-এরিস্‌ থেকে। কেবল একটি এসেছে তাদের গ্রাম থেকে।

ব্যস—লক্ষ্য কর তাকে—বেরিয়ে যাবে ঠিক্‌! চোর ধরা পড়্‌বে নিশ্চয়ই! হলো তো? দাদা যে তাকে ডিটেক্‌টিভ্‌-বই পড়তে মানা করে দিয়েছিল! এইবার?

কল্পনার চক্ষে শ্রীমান্‌ গণেশ দেখ্‌ছে যে দাদা তার বুদ্ধির তারিফ্‌ করছে আর রজনী ঘোষের দোকান থেকে এক ঠোঙ্গা খাবার এনে তাকে আদর করে খাওয়াচ্ছে! কিন্তু কল্পনার ছবি ভেসে গেল তার দাদার জুতোর শব্দে—আবার সে আরম্ভ করলে "ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ এ্যাঁ—এ্যাঁ—ভারতবর্ষ—"

হাই তুলে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

পরের দিন যখন শুন্‌ল বাড়ীর কারও কিছু চুরি যায় নি, খবরের কাগজে কোনও হীরক-চুরির বা কোনও হত্যাকাণ্ডের খবর দেয় নি, তখন সে বেশ একটু হতাশ হ'ল। কিন্তু এমনও ত' হ'তে পারে, অনেক হত্যাকাণ্ড হয়ে যাচ্ছে যার কোনও পাত্তাই পাওয়া যায় না!

ঠিক সন্ধ্যার সময়, দাদারা মাঠ থেকে খেলা করে ফেরে নি—শ্রীমান্‌ গণেশ বেরিয়ে পড়ল উপেন ডাক্তারের বাড়ীর দিক দিয়ে। হঠাৎ দেখে, ঈস্‌—গায়ে তার রোমাঞ্চ হ'ল—একটি লোককে চুপি চুপি কতকগুলো লোক ধরাধরি করে একটি গাড়ী থেকে নামিয়ে—সুড়ুৎ করে ডাক্তারের বাড়ীর দিকটায় ঢুকে পড়্‌ল।

পা টিপে টিপে শ্রীমান্‌ গণেশ তাদের জানালার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

ভিতরে একটি চাপা আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ। কে যেন বল্‌ছে, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মরে গেলুম—উঃ! মেরে ফেল্‌লে আমায়!"

অজ্ঞাত আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ল গণেশ—সত্যিই কী লোকটাকে খুন করছে নাকি? ইচ্ছে হ'ল পাঁচিল বয়ে উঠে রিভল্‌ভার নিয়ে একেবারে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলে—"হাত তোল!" তা' হ'লে লোকটাকে দস্যুদের কবল থেকে বাঁচান যেতে পারত! কিন্তু রিভল্‌ভার সে পায় কোথায়?

হুঁ, হয়েছে! অপুর খেলার রিভল্‌ভারটা নিয়ে বেরুলে কেউ টের পাবে না যে ওটা খেলার রিভল্‌ভার নয়; কিন্তু আজ ত' আর এ অবস্থায় ফিরে গেলে চলে না—এ ব্যাপারটা ভাল করে দেখ্‌তেই হবে এবং এর একটা কিনারা করতেই হবে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে আর একটু অগ্রসর হ'তেই দেখে, অন্ধকারের মধ্যে ডাক্তারবাবু আর কম্পাউণ্ডার এসে দাঁড়াল। কান পেতে শুন্‌তে পেল সে, ডাক্তারবাবু বল্‌ছেন "সাবধান, রক্তটা কেউ যেন দেখ্‌তে না পায়!"

হুঁ—তা' হ'লে ডাক্তারের মুখোস পরে উনি একজন খুনী? আর ঐ তাঁর সহকারী? অথচ লোকে ভাবে, ইনি একজন দেবতা? আচ্ছা দেখি তারপর।

ঐ ত! ঈস্, এক গাম্‌লা রক্ত কম্পাউণ্ডার নিঃশব্দে নর্দ্দমায় ঢেলে দিয়ে গেল!

শিউরে উঠ্‌ল গণেশের সমস্ত শরীর। জলজ্যান্ত লোকটাকে মেরে ফেল্‌লে? নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে রইল। মশা কামড়াচ্ছে, কামড়াক্—একটু শীতও করছে! কিন্তু এর একটা শেষ না দেখে ত' আর যাওয়া যায় না!

জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলে শ্রীমান্ গণেশ—হুঁ, বেশ এক গোছা নোট ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিলে। টেবিলের ওপর কাপড় জড়িয়ে নিশ্চল নিস্পন্দ হ'য়ে শুয়ে আছে লোকটা!

উঃ! কী ভীষণ ষড়যন্ত্র! লোকালয়ের মধ্যে এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড নিঃশব্দে হ'য়ে গেল অথচ কেউ কিছু জান্‌বে না? এর একটা হেস্তনেস্ত সে করবেই করবে।

একটু পরে লোকটাকে ধরাধরি করে তারা বাইরে নিয়ে গিয়ে শোয়াল সেই গাড়ীটার মধ্যে।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"গাড়ীর পাল্লাগুলো তুলে দিয়ে নিয়ে যাবেন।"

হাঁ, তা' না হ'লে চল্‌বে কেন? লোকের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে হবে ত'! আবার ঐ লোকগুলো বলে কি? জীবনের কোনই আশা-ভরসা নেই! খুব খুসী হ'য়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু লোক দেখান কান্নার ভাণ করছে!

আচ্ছা লাশটা কী করে সরাবে? নিশ্চয় বল্‌বে রোগ হ'য়ে মরেছে।

গাড়ীটা ছাড়্‌ল—শ্রীমান্ গণেশ টুপ করে লুকিয়ে গাড়ীর পিছনে বসে পড়্‌ল। খানিকটা দূর গিয়েই গাড়ীটা একটা বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল—তারপর ধরাধরি করে তাকে নিয়ে লোকগুলো চলে গেল।

হ্যাঁ, বাড়ীটা ত' চেনা গেল। আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। সে দেখ্‌বেই দেখ্‌বে লাশ কেমন করে সরায় ওরা?

দু'দিন শ্রীমান্ গণেশের আর কোনও কাজ নেই—ফুরসুৎ পেলেই ছুটে গিয়ে দেখে আসে বাড়ীটা। কি জানি, লাশটা কে কখন সরিয়ে ফেলে! কিন্তু ডিটেক্‌টিভ্ বইয়ে ত' এমনধারা হয় না! ঠিক্ যে সময়টাতে ধরা পড়ে এমন সময়েই ত' গোয়েন্দারা পৌঁছে যায়!

আঃ ! ঠিক্ তাই। তৃতীয় দিনে সে দেখে যে একটা লাশ ঐ বাড়ী থেকেই বার করে নিয়ে যাচ্ছে—সঙ্গে লোকজনও রয়েছে অনেক। ওরা ত' আর শ্রীমান্ গণেশের মত ভিতরের খবর জানে না !

ঐ ত' কাবুকেও দেখা যাচ্ছে। ইসারা করে শ্রীমান্ গণেশ ডাক্‌লে, "কাবুদা, শুনে যাও।"

কাবু বল্‌ল, "কী রে ?"

—"ঐ যে মড়া নিয়ে যাচ্ছে—ওটা একটা হত্যাকাণ্ড—মানে মার্ডার-কেস্।"

—"দ্যুৎ ! কী করে জান্‌লি ?"

তখন তার গোয়েন্দাগিরির কাহিনী শ্রীমান্ গণেশ আনুপূর্ব্বিক বল্‌লে। কাবু বার-কয়েক আপত্তি করলে বটে, কিন্তু এমন অকাট্য যুক্তি দেখালে গণেশ যে, কাবু ভাব্‌লে হয় ত' সত্যিই।

এখন করা যায় কী ? গণেশ বল্‌লে, "দাঁড়া, একটা মতলব ঠাউরেছি।"

কাবু বল্‌লে, "মতলব ত' তুই দিনরাত ঠাওরাচ্ছিস্—এখন করা যাবে কী বল্।"

—"তুমি ঐ ডাক্তারের উপর কড়া নজর রাখ—আমি চট্ করে অপুর রিভল্‌ভারটা নিয়ে আসি।"

—"অপুর রিভল্‌ভার ? ধ্যেৎ, তোর মাথাটা একদম বিগড়েছে !"

—"আরে ঐ দেখেই ভয় পাবে, দেখঁনা !"

···উঃ! বাপ্‌রে মরে গেলুম······

শ্রীমান্ গণেশ চট্ করে রিভল্‌ভার নিয়ে এল। তার পর পা টিপে টিপে ঢুক্‌ল ডাক্তারের বাড়ীতে, খুব সাবধানে লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল যদি কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় !

হঠাৎ একটা কাত্‌রানি-আওয়াজ এল—"উঃ ! বাপ্‌রে, মরে গেলুম, মরে গেলুম—আমায় মারবেন না ডাক্তারবাবু—আমাকে বাঁচান—আপনার দুটি পায়ে পড়ি।" ডাক্তার উত্তরে বল্‌ছেন,

খোকার সাধ

—কুমারী উমা গুপ্তা

ফুটফুটে জোছনায় জানালার পাশে
খোকা একা বসে আছে চাঁদ-তারা হাসে।
মন তার ছুটে চলে চাঁদ-তারা দেশ,
সেথা কি যাইতে চাই পরীদের বেশ ?
পরীরা কি সেইখানে যেতে দিবে তায়,
পৃথিবীর ছেলেমেয়ে রবে কি আশায় ?
খোকা যদি একবারও যেতো সেই দেশে,
চাঁদিমার কত কথা বলিত সে এসে।

[৫৪৪ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ :

দরজা ঠেলে ঢুক্‌ল বেগে শ্রীমান্ গণেশ—পিছনে কাবু! চীৎকার করে গণেশ বল্‌লে—"চুপ করাচ্ছি, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওকে।" হাতে ওর উদ্যত রিভল্‌ভার—

হঠাৎ ডাক্তারবাবু চম্‌কে দু'হাত পেছিয়ে হাত উঁচু ক'রে দাঁড়ালেন। গণেশের বুকটা যেন দশ হাত ফুলে উঠ্‌ল! কিন্তু পরক্ষণেই ডাক্তারবাবু হঠাৎ হেসে বল্‌লেন—"আরে গণেশ না? কী ব্যাপার? রিভল্‌ভার তুলে ভয় দেখাতে এসেছ?"

গম্ভীরভাবে গণেশ বল্‌লে—"সব জেনেছি আমি—এবার পরিত্রাণ নেই।"

রিভল্‌ভার শুদ্ধ্ গণেশকে কোলে নিয়ে ডাক্তার বল্‌লেন—"অভিনয়টা বেশ্ করেছ কিন্তু, সত্যিই আমি ভয় পেয়ে গেছলুম।"

* * * * *

সন্ধ্যা বেলা—ডাক্তারবাবু গণেশের বাবার সঙ্গে চা খেতে খেতে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ছেন শোনা গেল—"আরে সেই অমরবাবুর ব্লাড্-প্রেশার ছিল না! তার ওপর আবার হঠাৎ হলো রক্তবমি! তাই নিয়ে এত কাণ্ড! কিন্তু তোমার পুত্র গণেশ তো দিব্যি এক ডিটেক্‌টিভের বিদ্যে দেখিয়ে দিলে! ব্যাপারটা করেছে সে বেশ। সত্যিই আমি ভয় পেয়ে গেছ্‌লুম!"

বুড়িবালামের তীরে

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

চরিত্র

মিঃ কেনেডী—জনৈক ইংরেজ ব্যারিষ্টার।

যতীন—বিপ্লবী বীর। (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন)

সামসুল আলম—সি. আই. ডি. অফিসার।

রামভুজ, ইলাহি —মিঃ কেনেডীর দরওয়ান ইত্যাদি।

বিহারী, বলাইচরণ, নীরদ —সি. আই. ডি. কর্ম্মচারী।

বসন্ত চ্যাটার্জ্জি—উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী।

হুইলার—গভর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী।

২নং যতীন মুখার্জ্জি—হুইলার সাহেবের কর্ম্মচারী।

নীলকণ্ঠ—হুইলার সাহেবের বেয়ারা।

অনাথবন্ধু, ললিতমোহন —যতীন্দ্রের মাতুল।

বীরেন, ললিত চক্রবর্ত্তী, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ, নীরেন —যতীন্দ্রের সহকর্ম্মিগণ।

রাসবিহারী বোস—মহাবিপ্লবী।
সুকুমার—রডা কোম্পানীর কেরাণী।
জেলার, হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডার, ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, বালকগণ, বুড়ী।

দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার একটি বাড়ী।

সুকুমার ও মনোরঞ্জন।

সুকুমার। দশ বাক্সের বেশী সরানো সম্ভব হ'ল না ভাই! ওতে পঞ্চাশটা পিস্তল আছে, আর বহু গুলি।

মনোরঞ্জন। তোমার উপর ত পুলিশের সন্দেহ হবে?

সুকুমার। তা ত হবেই! এবং চাকরীটাও যাবে! তার জন্য ভাবি না। দেশের কাজে তোমাদের সামান্য সাহায্য ক'রতে পেরেছি, এর চেয়ে আনন্দ আর কী হ'তে পারে?

মনো। তুমি যা'চ্ছ না কি? যতীন দা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না?

সুকুমার। এখন ত' আর দেরী ক'রতে পারছি না! রডা কোম্পানীর বড় সাহেব সন্ধ্যাবেলায় গুদাম পরীক্ষা করেন রোজ! এতক্ষণ নিশ্চয় সে-পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, আর নব্বই বাক্সের ভিতর দশটা বাক্স যে নিখোঁজ, তা ধরা পড়েছে। জাহাজ থেকে মাল খালাস ক'রে গুদামে তুলেছি আমি, সুতরাং পুলিশে এতক্ষণ ডায়েরী হ'য়ে গেছে আমার নামে। পুলিশ এসে পড়ার আগে বাড়ী থেকে কতকগুলো জিনিষপত্র সরানো দরকার। এই দু' চারখানা বই, একটা পুরোণো পিস্তল—এই সব আর কি!

মনো। সে সব সামলে রেখেই তুমি চ'লে এস এখানে। জেলে প'চে লাভ কী?

সুকুমার। তা ত বটেই! আর, হাজতে যা মারে শুনেছি, তাতে হয়ত বাধ্য হ'য়ে শেষে তোমাদের নামধাম ব'লে ফেলব। যে কাজটুকু ক'রেছি, তা আবার নিজে পণ্ড ক'রবার জন্য আগ্রহ আমার নেই। আমি পালিয়েই আসব—

(প্রস্থান)

(পিছনের দ্বার খুলিয়া যতীন্দ্রের প্রবেশ)

যতীন্দ্র। চ'লে গেল না কি সুকুমার?

মনো। গেল। তুমি দেখা দিলে না কেন ওকে?

যতীন্দ্র। দেব। আগে ওর মতিগতি আরও একটু বুঝি!

মনো। সে কি? ওর মতিগতি বুঝতে এখনো বাকি আছে না কি? চাকরির মমতা না রেখে, পুলিশের ভয়কে অগ্রাহ্য ক'রে—

যতীন্দ্র। জানি, জানি। রডা কোম্পানীর দশ বাক্স পিস্তল-টোটা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে ও খুবই উপকার ক'রেছে আমাদের, তাও মানি।

কিন্তু তবু, একটু বাজিয়ে দেখতে চাই। আশা করি আমাদের নতুন বন্ধুকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যই দেখতে পাব। কিন্তু কখনো কখনো গুপ্তচরেরা এই রকম ফিকির ক'রেই গুপ্তসমিতিতে প্রবেশ ক'রেছে, এ কথা ভুলে যাওয়া নিরাপদ নয়।

মনো। তুমি এত ভেবে কাজ কর দাদা?

যতীন্দ্র। এখন শোন্ কাজের কথা। ঐ যে পঞ্চাশটা মশার পিস্তল—ও সমান ভাগে ভাগ ক'রে নিতে হবে—যুগান্তর দল, অনুশীলন দল, আর আমাদের মধ্যে। টোটা বারুদও। সে ভাগ এখুনি করা চাই। অত চোরাই মাল, অমন সাংঘাতিক মাল আমরা এক জায়গায় রাখতে পারি না। নীরেনকে ব'লে আয়—সব সমান তিন ভাগ ক'রে ফেলুক এখনই। আমি তার পর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছি ও-সব।

[মনোরঞ্জন সম্মুখ দিক দিয়া বাহির হইল, পিছনের দরজা দিয়া চিত্তপ্রিয়র প্রবেশ]

চিত্ত। ভগবান প্রসন্ন। রাসবিহারী বাবু কবে অস্ত্র পাঠাবেন, সেজন্য হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকার দরকার নেই আর। আমরা এইবার কাজ সুরু ক'রে দিতে পারব।

যতীন্দ্র। কাজ? পিস্তল দিয়ে ডাকাতি বা খুন করা চ'লতে পারে। সত্যিকার লড়াই ত আর তা দিয়ে হবে না!

চিত্ত। লড়াই? ও বাবা!

যতীন্দ্র। (হাস্য) সে কি! তুই কি ভয় পেতে সুরু ক'রলি না কি এতদিন বাদে?

চিত্ত। ক'রব না কেন? একে ভদ্রলোকের ছেলে, তায় বাঙ্গালী, লড়াই আমরা প্রতাপাদিত্যের যুগের পরে আর করি নি। ডাকাতি বল, খুনখারাবি বল, শলাপরামর্শ বল—হ্যাঁ, ও-সবের ভিতরে থাকতে পারি। কারণ ও সব ক'রেও সাধারণতঃ পালাবার ফুরসুৎ মেলে! কিন্তু লড়াই? ওরে বাবা।

যতীন্দ্র। লড়াই ক'রেও পালানো যায় রে যায়!

চিত্ত। উঁহুঃ, যায় না! কী ক'রে যাবে? দশ মাইল দূর থেকে গোলা এসে ফাটছে তোমার পায়ের কাছে, বোঁ বোঁ ক'রে জঙ্গী প্লেন উড়ছে তোমার মাথার তিন মাইল উপরে। খবর কাগজে প'ড়ছ না—কাইজারী কাণ্ড? মহাযুদ্ধে ইউরোপের অর্দ্ধেক যে সাবাড় হ'য়ে গেল! ক'টা লোক ওর ভিতর থেকে পালাতে পারছে শুনি?

যতীন্দ্র। তারা ভেতো বাঙ্গালী নয়, পালাবার কথা তাদের মগজে আসে না। কিন্তু শোন্—পিস্তলগুলির ব্যবহার আজই করা চাই।

চিত্ত। কোথায়?

যতীন্দ্র। এক সঙ্গে দুই জায়গায়। গার্ডেন রীচে একটা, বেলেঘাটায় আর একটা। বাড়ী দু'টো ত তোকে দেখিয়ে রেখেছি!

চিত্ত। কিন্তু দু'জায়গায় এক সময়ে …হাজির হবে কি ক'রে?

যতীন্দ্র। অনায়াসে! রা'ত …টায় গার্ডেন রীচ, রাত দু'টোয় …টা। বেলেঘাটায় তুই লোকজন …মজুদ থাকবি আগে থেকে—আমিও …কার কাজ সেরে ঠিক সময়মত …জুটব।

(নীরেনের প্রবেশ)

নীরেন। বাক্সগুলো খুলে জিনিষ …ভাগ ক'রে ফেলেছি।

যতীন্দ্র। ঠিক আছে। জ্যোতিষ …?

(জ্যোতিষের প্রবেশ)

জ্যোতিষ। এই যে দাদা!

যতীন্দ্র। দুইজন তোমরা গাড়ী নিয়ে …বেরিয়ে যাও। যুগান্তর দলকে এক ভাগ, …নদের আর এক ভাগ দিয়ে এসো …গুলি। আর নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসো— …এগারোটায় এখানে এসে জুটবার …। এক এক দল থেকে বাছাই করা পাঁচজন লোক, বেশী নয়।

নীরেন। নিমন্ত্রণটা কিসের—সেটা ব'লতে হবে ত?

চিত্ত। না, না, ওকথা কেউ জিজ্ঞাসা ক'রবে না!

যতীন্দ্র। করে যদি, ব'লবি মৃগয়ার! আজ আমাদের আহেরিয়ার উৎসব।

(নীরেন ও জ্যোতিষের প্রস্থান)

যতীন্দ্র। চিত্ত!

চিত্ত। দাদা!

যতীন্দ্র। কখনো কি ভেবে দেখেছিস —কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস্?

চিত্ত। ভেবে দেখা? অনেকদিন ও অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি দাদা! যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। ভাবার ভারটা তোমার উপরে।

যতীন্দ্র। কিন্তু আমি কি অতখানি ভার নেবার যোগ্য? বীরেন, ললিত— এরাও ভাবনাচিন্তার ভার আমার উপর সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। একজন ফাঁসীতে ঝুলেছে, আর একজন জেলের ঘানি টা'নছে। আমি কি তাদের অতখানি আস্থার মর্য্যাদা রাখতে পেরেছি?—না, মাঝে মাঝে নিজের কাছেই নিজে লজ্জায় নতশির হ'য়ে পড়ি।

চিত্ত। হ'য়েছে! যা একটু অন্ধকারে আলো দেখা গিয়েছিল, এইবারে বুঝি তার উপরে অমাবস্যা ঘনিয়ে এল একেবারে! এর নাম কী? রাণা প্রতাপের অবসাদ? শিবাজীর দিল্লী যাত্রা?—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! বাংলার বাঘকে আমরা দেখতে চাই সর্ব্বদা উচ্চশির! কে কোথায় পথের পাশে প'ড়ে ম'রল—তার হিসাব রাখবার ভার ইতিহাসের, রণনেতার নয়!

যতীন্দ্র। রণনেতা? সত্যই কি বাংলা তার রণনেতার পদে বরণ করতে চাইছে এই ভূতপূর্ব্ব ষ্টেনোগ্রাফার যতীন মুখুজ্জেকে? একদিন মজঃফরপুরের কেনেডী সাহেব আশীর্ব্বাদ ক'রেছিলেন, মনে পড়ে। তিনি ব'লেছিলেন—'গ্যারি-

বল্ডী-ক্রমওয়েলের মতই বীর যেন তুমি হ'তে পার।'—পারব, কি বলিস চিত্ত ?

চিত্ত। পারবে না ব'লে যদি সন্দেহ হত, তা হ'লে এই চিত্ত চৌধুরী এসে সাগরেদ হ'ত না তোমার। ডাকাতি আর খুন সমর্থনযোগ্য শুধু একটা অবস্থায়, যখন তাদের ভিতর দিয়ে ছাড়া স্বাধীনতা-যুদ্ধের পথে অগ্রসর হবার অন্যপথ থাকে না। তুমি স্বাধীনতার সমরে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে—এই আশাতেই তোমায় নেতা ব'লে গ্রহণ ক'রেছি।

যতীন্দ্র। স্বাধীনতার যুদ্ধ! স্বাধীনতার যুদ্ধ! (হঠাৎ হাসিয়া) অথচ ছোকরা একটু আগে ব'লছিল—লড়াইয়ে সে কস্মিনকালে যাবে না—কারণ ওর ভিতর থেকে পালাতে পারার আশা কম।

(মনোরঞ্জনের প্রবেশ)

মনো। জ্যোতিষ ফিরে এসেছে—অনুশীলন দলের পাঁচজন লোক নিয়ে।

যতীন্দ্র। এত আগে ?

চিত্ত। (ঘড়ি দেখিয়া) খুব আগে নয়, সাড়ে দশটা রা'ত।

যতীন্দ্র। ওদের পাঁচ, এদের পাঁচ—এই হ'ল দশ। এদিকে আমরা আছি—আমি, চিত্ত, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ, নীরেন—এই পাঁচ। সাকুল্যে পনেরো। ছয়জন চ'লে যাও বেলেঘাটায়। ঘাঁটি আগলে থাক সাবধানে। আমরা বাকী নয়জন ততক্ষণ গার্ডেনরীচের কাজটা সেরে আসি। ওখান থেকে ফিরবার পথে মাল নিয়ে ছয়জন চ'লে যাবে উত্তরপাড়ার ভাঙ্গা শিব-মন্দিরে। বাকী তিনজন বেলেঘাটায় গিয়ে জুটব। তাহ'লে বেলেঘাটার ব্যাপারেও নয়জন হ'ল।

চিত্ত। বেলেঘাটা সমাধা হ'লে-তখন ?

যতীন্দ্র। তখন তুই আর আমি ফিরে আসব এইখানে। আর হয়ত জ্যোতিষ কি নীরেন—একজন। বাকী ছয়জন মাল নিয়ে চ'লে যাবে উত্তরপাড়ায়। রাত্রের ভিতরেই আমরাও যদি উত্তরপাড়ায় না পৌঁছে যাই, কালকার দিনটা ঘাপটি মেরে মন্দিরের ভিতর প'ড়ে থাকবে সবাই। তারপর রাত্রি বেলা আমরা গিয়ে প'ড়ব। খবর্দার—কেউ যেন দিনের বেলায় উত্তরপাড়ার পথেঘাটে না বেরোয়। ক্ষিধে পেলেও না! তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও না!

চিত্ত। রাস্তায় বেরুতে হবে কেন? গঙ্গার উপরেই মন্দির। আর গঙ্গার জলে তেষ্টাও মেটে, ক্ষিধেরও শান্তি হয়।

মনো। এবং দেহও শুদ্ধ হয়। পরলোকপ্রাপ্তি যদি হাতে হাতেই ঘটে, স্বর্গে যাওয়া অনিবার্য।

(জ্যোতিষ ও নীরেনের প্রবেশ)

নীরেন। পাঁচজন এনেছি যুগান্তরের। পিস্তল পেয়ে য়্যায়সা খুসী তারা—

জ্যোতিষ। চুপ্ কর এখন। দাদা—অতঃপর ?

যতীন্দ্র। অতঃপর—কুইক মার্চ! কিন্তু একটু ভেবে নাও। চিত্ত ব'লছিল

ভাবনা চিন্তার ভার আমার উপর। ...ীয় ভাবনা ভাবতে বলছি না ...। শুধু এইটুকু ভেবে দেখতে ... যে ভাবনা চিন্তার ভার আমার ... দিয়ে তোমরা সবাই ষোল আনা ... আর সন্তুষ্ট কি না! আজ আমরা ...খানায় এসে দাঁড়িয়েছি। দু'টো বৃহৎ ...মায় চ'লেছি—দেশমাতৃকার কর ...দায় করবার জন্য। যাদের অন্তরে ... দ্বিধা আছে, তারা আমায় ছেড়ে ...নের পথ ধরতে পার এখনো। যারা ... বামপন্থী, মনেপ্রাণে অগ্নিমন্ত্রের ...রী, তারাই শুধু এস আমার সঙ্গে। ..., আজকার এ ডাকাতির পরে ফিরে ...বার পথ আর থাকবে না।

সকলে। কে চায় ফিরে যেতে?

চিত্ত। জীবনে মরণে আমরা ...মার সঙ্গী।

অন্য সকলে। আমরা সবাই! আমরা সবাই!

যতীন্দ্র। চল তবে মায়ের নামে ... আদায় ক'রতে বেরিয়ে যাই— ...জী মহারাজার সেনানীদের মত! ... মাতরম্—

সকলে। বন্দে মাতরম্—

(প্রস্থান)

[চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। দূর হইতে যেন ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল বন্দুকের শব্দের, মরণাহতের আর্ত্তনাদের, আর সমুচ্চ বন্দে মাতরম্ গর্জ্জনের। পরে ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতর আলো জলিয়া উঠিল। চিত্তপ্রিয় ও যতীন্দ্র প্রবেশ করিলেন—উভয়েই অল্প আহত]

চিত্ত। তোমার কপালে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দরকার, দাদা!

যতীন্দ্র। এ একটা পাথরের ঢিল শুধু। কিন্তু তোর বাঁ হাতে ওটা গুলি। দারোয়ান ভোজপুরীটা তাক ঠিক ক'রে মারতে পারে নি, তা যদি পারত—তাহ'লে স্বদেশী পল্টনের সৈন্যসংখ্যা ক'মে যেত একজন।

চিত্ত। তুমি কি ব্যাণ্ডেজের কাপড় খুঁজছ? আরে না না, এত তাড়া নেই।

যতীন্দ্র। তাড়া না থাক, ফুরসৎ যখন পাওয়া গেছে, এই বেলা বেঁধে দিই। পুলিশ পিছু নিয়েছে কি না, ঠিক কি! যদি এসে তাড়া করে—

(ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিলেন)

চিত্ত। টাকা হ'ল কত?

যতীন্দ্র। দুই জায়গায় মিলে চল্লিশ হাজার মোটে। লোকের আবার আজকাল বদভ্যাস দাঁড়িয়েছে কিনা—ব্যাঙ্কে টাকা পাঠিয়ে দেয়! বাড়ীতে কমই রাখে!

চিত্ত। চল, একটা বড় ব্যাঙ্কেই হানা দিই একদিন। এক ধাক্কায় যে কয় লাখ দরকার, নিয়ে আসতে পারব!

যতীন্দ্র। অসুবিধেও আছে, আপত্তিও আছে।

চিত্ত। অসুবিধে বুঝি—ব্যাঙ্ক রাত্রে খোলে না। কিন্তু আপত্তি কিসের?

যতীন্দ্র। আপত্তি—ব্যাঙ্ক যদি ফেল হয়, দেশের অনেক গরীব লোক মারা প'ড়বে! আমাদের ত গরীবের সঞ্চয় কেড়ে নেওয়ার ব্রত নয়!

(জ্যোতিষের প্রবেশ)

জ্যোতিষ। দাদা!

যতীন্দ্র। কী রে? একা নীচে ভয় ক'রছে না কি?

জ্যোতিষ। তোমার সবেতেই ঠাট্টা। এই নাও পত্র!

যতীন্দ্র। পত্র? (পত্র লইয়া পড়িলেন) এই নাও চিত্ত বাবু, আমাদের শ্রীমান্ সুকুমার ধরা পড়েছেন।

চিত্ত। সুকুমার?

যতীন্দ্র। আরে, রডা কোম্পানীর সেই কেরানী, যে দশ বাক্স পিস্তল—

চিত্ত। ধরা প'ড়েছে?—কিন্তু চিঠি নিয়ে এল কে?

জ্যোতিষ। তার নাম নীরদপ্রকাশ, সুকুমারের বন্ধু।

যতীন্দ্র। চিঠিতে নীরদের নাম ত লেখাই আছে! শোনো চিঠিটা—

"ভাই মনোরঞ্জন বাবু,

ধরা প'ড়ে গেলাম। বাড়ীর চারিধারে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। পাশের বাড়ীর ছাদে বন্ধু নীরদপ্রকাশ এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে ছুঁড়ে দিচ্ছি এই কাগজখানা। তাকে মৌখিক ব'লে দিচ্ছি অতি গোপনীয় দুই চারিটি কথা। তার কাছেই শুনবেন সব। পুলিশ দরোজা ভাঙ্গছে, আর নয়। সুকুমার।"

জ্যোতিষ। ওকে আমি নীচের ঘরে বসিয়ে এসেছি।

যতীন্দ্র। ইতিমধ্যে সে যদি এখানে পুলিশ ফোর্স নীচের ঘরে ঢুকিয়ে থাকে?

জ্যোতিষ। সে কি?—কিন্তু, চেষ্টা করলেও হঠাৎ তা পা'রবে না। তাকে ঘরে ঢুকিয়ে সদর দরোজা আমি ভিতর থেকে ডবল তালায় বন্ধ ক'রেছি।

যতীন্দ্র। তবু ভাল! (চিন্তা)

চিত্ত। দাদা কি লোকটাকে সন্দেহ ক'রছ?

যতীন্দ্র। তা ক'রছি বই কি! অবশ্য পরে সন্দেহ মিথ্যা ব'লে প্রমাণ হ'তে পারে। কিন্তু আপাততঃ আমি বাধ্য হ'চ্ছি সন্দেহ ক'রতে।

চিত্ত। কী সন্দেহ?

যতীন্দ্র। দু'রকম হ'তে পারে। হয় সুকুমার পুলিশের অনুরোধেই মশার পিস্তল ঘুষ দিয়েছে—আমাদের বিশ্বাসভাজন হবার জন্য, আর এখন সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এই গুপ্তচরকে পাঠিয়েছে হাল হদিশ দেখে যাওয়ার জন্য; অথবা—

চিত্ত। অথবা?

যতীন্দ্র। অথবা হয়ত সুকুমার নিজে কোন ষড়যন্ত্রের ভিতর নেই, ধরা প'ড়ে মা'র খেয়েছে বেদম, আর জান বাঁচাবার জন্য পুলিশের হুকুমে লিখে দিয়েছে এই চিঠি। তা যদি হয়—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

চিত্ত। দাদা, তোমার চোখ দিয়ে আগুন ছুটল যে!

যতীন্দ্র। জ্যোতিষ, ডেকে আনো ওকে!

(জ্যোতিষের প্রস্থান)

যতীন্দ্র। আগুন? আগুন আজ ছোটাবো চিত্ত! মনে পড়ে প্রতি পদে ইংরেজ পুলিশের নির্ম্মম অত্যাচারের কথা? অরবিন্দ বারীন্দ্র কেউ বাদ যান নি ওদের নিগ্রহ থেকে। আমি বাদ যাইনি। বাদ যাস নি তুই, বাদ যায় নি বীরেন, ললিত। তারও আগে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, সত্যেন—না, না চিত্ত! একটা শিক্ষা দেওয়ার কল্পনা অনেকদিন থেকে মাথায় এসেছে আমার। নখের ভিতর সূঁচ ফোটানো, স্ক্রু-ওয়ালা লোহার জুতো পরিয়ে পা গুঁড়ো ক'রে দেওয়া—আমাদের অবশ্য ওসব সরঞ্জাম নেই—কিন্তু ধর চিত্ত এই পিস্তল ধর—

(নীরদকে লইয়া জ্যোতিষের প্রবেশ)

নীরদ। সুকুমারকে ধরে নিয়ে গেল মশাই—

যতীন্দ্র। কোথায় নিয়ে গেল?

নীরদ। লালবাজার।

যতীন্দ্র। কী ক'রে জানলেন? সঙ্গে গিয়েছিলেন নাকি?

নীরদ। না, সঙ্গে যাব কেন? তবে ওখানেই ত নাকি নিয়ে যায় সবাইকে!

যতীন্দ্র। কী কথা ব'লতে এসেছেন?

নীরদ। সুকুমার আপনাদের খুব সাবধানে থাকতে ব'লল—

যতীন্দ্র। কোথায় থাকতে ব'লল? এই বাড়ীতে?

নীরদ। হ্যাঁ, এই বাড়ীতেই বই কি! প্রাণ গেলেও সুকুমার এ বাড়ীর ঠিকানা পুলিশকে ব'লবে না—

যতীন্দ্র। আপনি এখন কোথায় ফিরে যাবেন?

নীরদ। লালবাজার—

(সকলের উচ্চহাস্য)

নীরদ। অ্যাঁ! না, না—লালবাজার কেন? নিজের বাড়ীতে! নিজের বাড়ীতে!

যতীন্দ্র। নিজের বাড়ী আপনার নরকে। সেইখানেই যান—

(যতীন্দ্রের ইঙ্গিতে চিত্ত পিস্তল সন্ধান করিল)

নীরদ। ও কি! ও কি! আমার গুলি ক'রছেন না কি! না, না, আমি স্পাই নই, সুকুমারের বন্ধু আমি—

(চিত্ত গুলি করিল, নীরদের পতন)

যতীন্দ্র। সামসুল আলম ছিল নম্বর এক, তুমি হ'লে নম্বর দুই। চল চিত্ত, চল জ্যোতিষ, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়!

(তিনজনের প্রস্থান)

নীরদ। For king and country! I die for king and country. কিন্তু—আজ মনে হ'চ্ছে কে সে king? আমি সামান্য বেতনের বিনিময়ে যার জন্য জীবন দিলাম—কে সেই king? আমার জাতের সে কেউ নয়, আমার দেশের সে কেউ নয়। ওঃ—এতদিন কেন বুঝিনি?

[ক্রমশঃ]

একটুখানি হাসো

টেকো। ওহে নাপ্‌তের পো, আমার এই বিরাট টাকের কয়েকটি চুল কাট্‌তে আট আনা চাচ্ছ কেন ?

নাপিত। ওই বলেইতো চাচ্ছি মশাই ! খাটুনি অনেক, টাক থেকে চুলগুলি খুঁজে খুঁজে কাট্‌তে হবে যে !

*　　*　　*　　*

রোগী। দাঁত তুলতে আপনার মজুরিতো ২৲ টাকা মাত্র ; কিন্তু আমার কাছ থেকে ৮৲ টাকা চাচ্ছেন কেন ?

ডাক্তার। হাঁ হাঁ, আমার মজুরি ২৲ টাকাই বটে, কিন্তু দাঁত তুলবার সময় আপনি এমন চীৎকার করেছিলেন যে, আমার আর তিনটি রোগী ভয়ে পালিয়ে গেছে। কাজেই তাদের ৬৲ টাকাও আপনার দিতে হবে।

*　　*　　*　　*

মন্টু। ওরে দাদা, ও লোকটা এত লম্বা ; সে মাথার চুল আঁচড়ায় কি করে ? অত উঁচুতে হাত যায় ?

ঝন্টু। এটা আর বুঝ্‌তে পারছিস না মন্টু ! একটা মইয়ের উপর উঠে ও চুল আঁচড়ায়।

রান্না ঘর

মুগপুলী

উপকরণ ঃ—ভাজা মুগ ডাল ।০ পোয়া, চিনি ।৷০ সের, শুক্‌নো ক্ষীর ।৵০ পোয়া, ঘি ।০ পোয়া, সামান্য চালের গুঁড়ো।

প্রণালী ঃ—পরিমাণ মতো জল দিয়ে ভাজা মুগডালগুলি সিদ্ধ করে নিন। এমন ভাবে জল দেবেন যেন ডাল সিদ্ধ হবে কিন্তু গলে যাবে না বা জল থাকবে না। সিদ্ধ ডালগুলি চালের গুঁড়ো দিয়ে বেশ করে চট্‌কে মেখে নিয়ে ময়দার লেচীর মতো ছোট ছোট গুটী তৈরী করুন। ঐ-গুটীগুলি হাত দিয়ে টিপে টিপে বাটির মত গর্ত্ত করে ভেতরে শুকনো ক্ষীর পূরে দিন এবং দুই ধার একত্রে চেপে বন্ধ করে দিন। গরম ঘিয়ে বেশ বাদামী রং করে ভেজে তুলুন। কড়াইতে অল্প জল ও চিনি দিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন। রস যখন বেশ ঘন হয়ে আঁস ছাড়বে তখন ঐ ভাজা পুলীগুলি ওর ভেতরে ছেড়ে দিয়েই নামিয়ে নিন। একটা আলাদা পাত্রে ঠাণ্ডা হতে দিন। এখন দেখবেন চিনি সব শুকিয়ে পুলীর গায়ে লেগে গিয়েছে এবং খেতে বেশ মচমচে ও সুস্বাদু হয়েছে।

—কুমারী হাসি দাশ

বেগুনের কাটলেট

উপকরণ ঃ—বেগুন এক সাইজের এবং গোল যতগুলি আন্দাজ করবেন, মাংসের কিমা, পিঁয়াজবাটা, আদা বাটা, লঙ্কা বাটা, ডিম, আদাকুচি, কাঁচালঙ্কাকুচি, পিঁয়াজকুচি, লবণ, ঘি।

প্রণালী ঃ—প্রথমে যতগুলি বেগুনের কাটলেট করবেন বেশ ভালভাবে দেখে রাখুন অর্থাৎ পোকা যেন না থাকে। বোঁটার উপর দিকের অংশ সামান্য কেটে ফেলে দিন এবং বাকিটা বেগুনে লেগে থাকবে, এখন বেগুনগুলি ঠিক মাঝামাঝি চিরে ফেলুন। তারপর একটি ডেকচিতে ঐ বেগুনগুলি সেদ্ধ করতে দিন এবং বেশী সেদ্ধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। যখন দেখবেন যে বেগুনের শাঁস নরম হয়েছে এবং খোসা বেশ শক্ত আছে তখন নামিয়ে ফেলে একটি থালাতে ঠাণ্ডা করতে দেবেন। বেশী সেদ্ধ হলে বেগুনের খোসা থেকে শাঁস বার করবার সময় খোসা ছিঁড়ে যেতে পারে। তারপর কিমাতে সব রকম মশলাবাটা দিয়ে সেদ্ধ করুন। অল্প লবণও দেবেন। এখন ঐ বেগুনগুলি একটি করে ধরে ধরে চায়ের চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে শাঁসগুলি কুরে বার করুন, ঐগুলি খোল হলো।

[বাকিটুকু ৬০ পৃষ্ঠায়

—শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ফুটবল লীগের সমাপ্তি

সাধারণের ধারণাকে ব্যর্থ না করে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পুনরায় কলকাতার ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে। তবে ১৯৫২ সালের লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য খেলোয়াড় ও দর্শকদের যে কত আশা-নিরাশার মধ্যে দুলতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব শেষ পর্য্যন্ত লীগ বিজয়ী হল। বাঙ্গালার ফুটবল খেলায় এই ক্লাবটি যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে গেল তা এখানকার খেলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্‌বে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ছয়জন ধুরন্ধর খেলোয়াড় হেলসিঙ্কি অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় দলের পক্ষে যোগদান করা সত্ত্বেও তারা যে ভাবে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিজেদের অভীষ্ট লাভ করতে সক্ষম হয়েছে তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

কলিকাতা লীগের অন্যতম দল মোহনবাগান অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদের দলে এবার যে কম ভাঙ্গন দেখা গেল এবং যেভাবে তারা ম্যাচের পর ম্যাচ হেরে শেষ পর্য্যন্ত ন'টি খেলায় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল, সে কথা ভাব্‌লে সত্যই আশ্চর্য্য হতে হয়। কেন তাদের এই দুরবস্থা হল এবং কেন যে তারা পর পর নয়টি খেলায় গোল করতে অশক্ত হল, জয় লাভ করার কথা বাদ দিলেও, এসব প্রশ্নের জবাব একমাত্র মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়গণ ও ক্লাব পরিচালকরাই দিতে পারেন। কতকগুলি খেলায়, বিশেষ করে উয়াড়ী ক্লাবের নিকট মোহনবাগানের অভাবনীয় পরাজয় সম্পর্কে অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে।

ইষ্টবেঙ্গলের পরই এবারকার খেলায় যে দলের নাম উল্লেখযোগ্য সেই দলটি হচ্ছে ভবানীপুর ক্লাব। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ৪ পয়েণ্ট পশ্চাতে অবস্থান করে তারা লীগে রানার্স আপ্‌ হয়েছে। রাজস্থান, বি এন আর, এরিয়ান্স ও ই আই আর, যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান অধিকারে সমর্থ হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং সপ্তম স্থান লাভ করেছে এবং তার নীচে জনপ্রিয় মোহনবাগান দলের স্থান। অন্ততঃ পচিশ বৎসরের মধ্যে মোহনবাগানকে লীগ খেলায় এ রকম চরম দুর্দ্দশা ভোগ করতে হয়েছে বলে মনে হয় না। মোহনবাগানের সঙ্গে সমসংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করে গোলের গড়পড়তায় যে দুটি দল তার নীচে অবস্থান করেছে, তারা হল পুলিশ ও কালীঘাট। এরা

প্রত্যেকেই ২৫টি পয়েন্ট অর্জ্জন করেছে। তার পর এলো দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে অবতরণ সম্ভব তিনটি দল—উয়ারী, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও জর্জ্জ টেলিগ্রাফ। এরা প্রত্যেকেই ২৪টি করে পয়েন্ট লাভ করেছে। ক্যালকাটা গ্যারিসন দল সামরিক দল হিসাবে সর্ব্বনিম্নে থাকা সত্ত্বেও নামিয়া যাওয়ার দুর্ভাবনা তাদের নাই।

লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে ইষ্টবেঙ্গলের যখন মাত্র এক পয়েন্ট বাকী সেই মুখে তারা মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে অপূর্ব্ব ক্রীড়া-দক্ষতার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও হেরে গেল। তখনও তাদের শেষ খেলা এরিয়ান্সের সঙ্গে বাকী। এই শেষ খেলায় একটি পয়েন্ট লাভের আশা সকলেই পোষণ করতে লাগলেন। কিন্তু এরিয়ান্স ক্লাব এমনই এক প্যাঁচ মেরে বস্‌ল যে ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থকরা তাতে বিশেষ দমে গেল। খেলার দিন ধার্য্য হল ৯ই আগষ্ট। কিন্তু এরিয়ান্স ক্লাব তাদের ফুটবল সম্পাদকের মাতৃবিয়োগের জন্য সেই দিন এক শোক-সভার আয়োজন করবে বলে স্থির করলে এবং আই এফ্ এ'কে খেলা স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ জানালে। আই এফ এ সে কথায় কর্ণপাত না করে খেলা হোক এইরূপ সিদ্ধান্ত করায়, ইষ্ট-বেঙ্গল, এরিয়ান্সের মাঠে খেলতে গিয়ে দেখ্‌ল যে এরিয়ান্সের তাঁবু তালাবন্ধ ও তাদের গ্যালারী দর্শকশূন্য। রেফারী ধুতি সার্ট পরে হেল্‌তে দুল্‌তে মাঠে নামলেন বটে কিন্তু নেমেই তিনি আই এফ এ'র দু' একজন কর্ম্মকর্ত্তাকে ডেকে দেখাতে লাগলেন যে মাঠের সীমানার দাগ মুছে গেছে। হেডওয়ার্ড কোম্পানীও এই দিন টিকিট বিক্রয় করে নাই। এর মূলে যে কি ছিল তা বলা শক্ত।

এমিল জাটোপেক—ইনি এসেছিলেন জেকোশ্লোভাকিয়া থেকে। পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দুটো দৌড়ই তিনি জিতেছেন। [ব্লক : পত্রিকার সৌজন্যে।

সে যা হোক না কেন, সেদিন মোট কথা খেলা হল না। ইষ্টবেঙ্গলের দর্শকরা ও খেলোয়াড়েরা তাঁবুতে ফিরে এল নিতান্ত হতাশ হয়ে। এবার কিন্তু তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌ল। তারা আর থাক্‌তে না পেরে ক্লাবের ধ্বজা উড়িয়ে দিলে এবং জয়োল্লাস করতে সুরু করে দিলে যেন লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ তাদের হাতের মধ্যে সেইদিনই এসে গেছে! রেফারী কিন্তু ওয়াক-ওভার দেন নাই, দেবার অধিকারও তাঁর নাই। দু'দিন পরে অর্থাৎ ১১ই আগষ্ট লীগ কমিটির সভায় এরিয়ান্সের কার্য্যাবলী অযৌক্তিক বিবেচিত হওয়ায় ইষ্টবেঙ্গলকে একটির বদলে দুটি পয়েন্ট দেওয়া হল। শেষ পর্যান্ত এরিয়ান্সের ম্যাচ না খেলেও ইষ্টবেঙ্গল জয়ী সাব্যস্ত হল। এরিয়ান্সের চাল খাট্‌ল না, বাজী হারতে হল।

নীচের দিকে উয়ারী স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও জর্জ্জ টেলিগ্রাফ সমান-সংখ্যক পয়েণ্ট লাভ করায় সকলেই আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে এরকম যে হতে পারে তা তাঁদের ধারণাতীত। নিশ্চয় কিছু "গড়াপেটার" ব্যাপার বলে অনেকেই অনুমান করছেন। তবে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই নিজেদের মধ্যে ছুটি করে অতিরিক্ত ম্যাচ খেলে নেমে যাওয়ার প্রশ্নের সমাধান করতে হবে।

শীল্ড খেলার কথা

লীগ শেষ হতে না হতে আই-এফ-এ শীল্ডের খেলা স্থুরু হয়ে গেছে। এই মুখে এসে পড়ল হেলসিঙ্কি-প্রত্যাগত কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড় দল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ত' "পোয়া-বার"! একেই তারা লীগ চ্যাম্পিয়ন, তার ওপর যদি এই ধুরন্ধর ছয়জন খেলোয়াড় বি বস্থু, চন্দন সিং, এস রায়, ভেঙ্কটেশ, আমেদ ও শালে তাদের দলগত শক্তিকে বৃদ্ধি করে, তাহলে তাদের গতিরোধ করতে পারে এমন কোন টিম ভারতবর্ষে আছে বলে মনে হয় না।

আরতি সাহা (বামে) ও ডলি নাজির অলিম্পিকে সাঁতারের প্রতিযোগিতায় ভারত হইতে গিয়াছিলেন। [ব্লক: পত্রিকার সৌজন্যে।

মোহনবাগান দলও বেশ পুষ্ট হবে মনে হচ্ছে। মোহনবাগান দলে বি এন রেলওয়ের এস ব্যানার্জ্জী ও জর্জ্জ টেলিগ্রাফের এস চ্যাটার্জ্জী, বি চ্যাটার্জ্জী ও বি মজুমদার যোগদান করার জন্য আই এফ এর অনুমতি চেয়েছেন। নূতন ক্লাব বদলের আইন অনুযায়ী তাঁদের এই আবেদন গ্রাহ্য হবে বলে আশা করা যায়। সম্মুথন, যিনি ভারতীয় দলের পক্ষে হেলসিঙ্কিতে গিয়েছিলেন, ও জে এ্যণ্টনীও নাকি মোহনবাগান দলে খেলবেন বলে কানাঘুষা চলছে।

আই এফ এ শীল্ডের খেলার তালিকা থেকে মনে হয় যে, উপর দিক থেকে মোহনবাগান ও বোম্বে ডায়নামোস্ এবং নীচের দিক থেকে ভবানীপুর ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব সেমিফাইনালে প্রবেশাধিকার লাভ করবে, অবশ্য যদি এর মধ্যে অঘটন কিছু না ঘটে।

ইতিমধ্যেই শীল্ড প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় রাউণ্ডে উপনীত হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ রাউণ্ডের পর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। শীল্ড শেষ হতে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি লাগবে। তবে এইটুকু আশা যে লীগের মত ঢিমে তেতালা গতিতে শীল্ড খেলা চলবে না।

ইষ্টবেঙ্গলের খেলার মানদণ্ড সকলের চেয়ে উচ্চস্তরের হওয়ায় তাদের যে বেশ সুবিধা হবে তা বলাই বাহুল্য। যে কোন বহিরাগত দলই হোক না কেন, ইষ্টবেঙ্গলকে হারাতে বেশ বেগ পেতে হবে।

মোহনবাগানের দলগত শক্তি নির্ভর করছে তাদের খেলোয়াড়-সমন্বয় ও পরিচালকমণ্ডলীর টিম নির্ব্বাচনের উপর। এই দুইটি দল যদি ফাইনালে উপনীত হয়, তা হলে আবার খেলার মাঠটা জমবে ভাল।

ইষ্টবেঙ্গল এবার নিয়ে ছ'বার লীগ পেয়েছে। এবার শীল্ডে জয় লাভ করলে ইষ্টবেঙ্গল ছয় বার লীগ বিজয়ী এবং উপর্য্যুপরি চার বার শীল্ড বিজয় গৌরবের অধিকারী হবে। কল্‌কাতার ফুটবল খেলার ইতিহাসে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের রেকর্ড স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বিশ্ব-অলিম্পিকে ভারতের স্থান

ব্যারণ কুবার্টিনের কথা—"অলিম্পিকে যোগদান করাই বড় কথা—জয়লাভ করা বড় কথা নহে।" এবারের অলিম্পিকে ভারতের পক্ষ থেকে যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের সেই কথাই আজ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের বিফলতা যে হয়েছে, সে কথা আর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার কোন মানেই হয় না। তবে ঝড়ের আগে এঁটো পাতের মত ম্যানেজারদের উৎসাহটা সাধারণের চোখে খুবই খারাপ দেখায়। নিজের দলের ওজন ভাল ভাবেই জেনে যাত্রার আগে তাঁদের হৈ হৈ করার হুল্লোড় দেখে মনে হয় যে বিশ্বের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে দেশভ্রমণের আনন্দ উপভোগের দিকেই নজর তাদের বেশী ছিল। হকিতে ভারতের মুখোজ্জ্বল হয়েছে। কিন্তু যে হকি দল বিশ্বের মাঝে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করল, যাত্রার আগে তাঁদের দেখা গিয়েছিল স্থির, ধীর—কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়তা ছিল তাঁদের চোখে-মুখে। যাত্রার দিনে তাঁদের কেউ লক্ষ্য করেনি। ফুটবল দলকে নিয়ে নেচে উঠেছিল ক্রীড়ামোদীরা। তাদের মাথায় করে তুলে দিয়েছিল এরোপ্লেনে। জোড়ায় জোড়ায় ম্যানেজার বুক ফুলিয়ে প্লেনে উঠেছিলেন—কিন্তু ফেরার সময় তাঁদের হেঁটমাথাও দেখল সকলে। আজ ভারত অকৃতকার্য্য হয়েছে, কিন্তু বিশ্বের ক্রীড়াক্ষেত্রের মান (Standard) ভারত হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। প্রতিযোগীদের

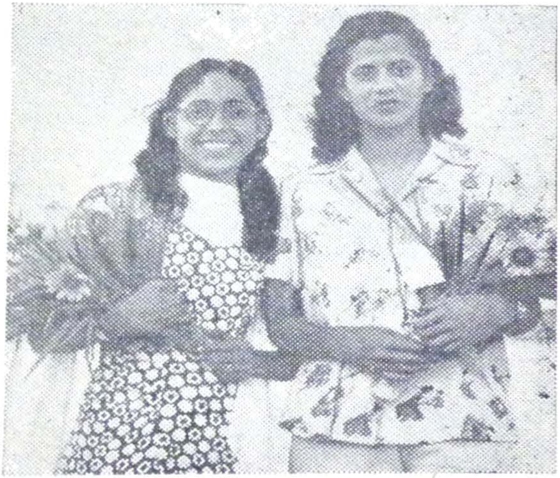

নীলিমা ঘোষ (বামে) ও মেরি-ডি-সৌজা (দক্ষিণে) দৌড়ের জন্য ভারত হইতে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় গিয়াছিলেন।
[ব্লক : পত্রিকার সৌজন্যে।

এই থেকে অন্ততঃ শিক্ষা পাওয়া উচিত যে ভবিষ্যতে বিশ্বের ক্রীড়াক্ষেত্রের উপযুক্ত না হলে দেশ ছেড়ে

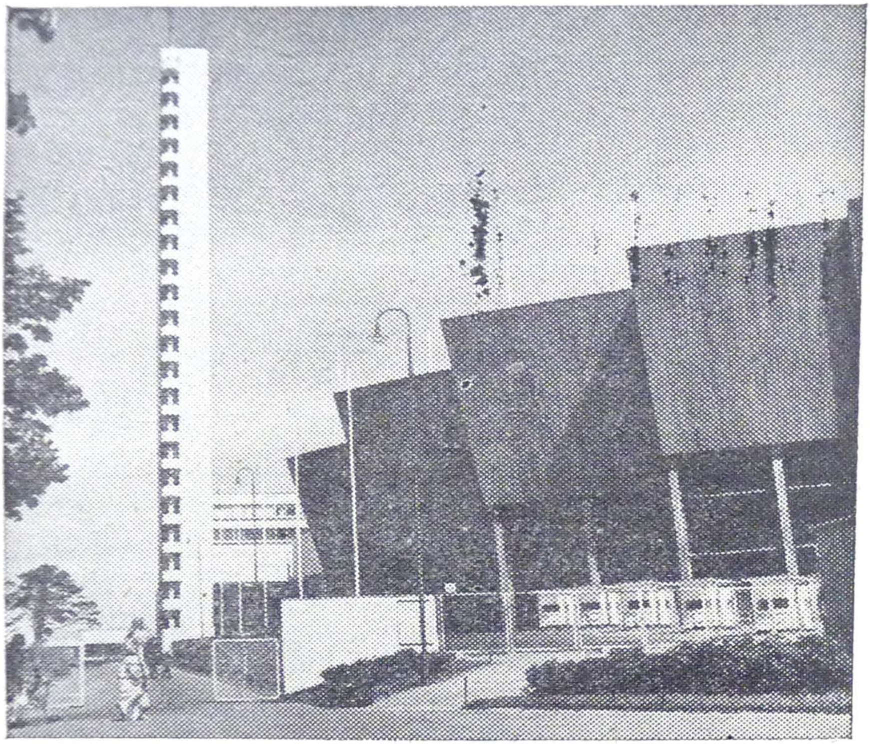

ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে এবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। চিত্রে অলিম্পিক ষ্টাডিয়মের টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। প্রায় ২৩৫ ফুট উঁচু এই টাওয়ারের মধ্যে খেলাধূলা-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি অফিস অবস্থিত আছে।

যাওয়ার কোন মানেই হয় না। আত্মবিশ্বাস ও অনুশীলন দ্বারা তাঁরা যেন পৃথিবীর মান-অনুযায়ী নিজেদের তৈরী করে নিতে পারেন।

[৫২৫ পৃষ্ঠার বাকিটুকু ।

এবার সেদ্ধ কিমার সঙ্গে বেগুনের শাঁস ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন এবং পিঁয়াজকুচি, আদাকুচি, লঙ্কাকুচি, লবণ ও চিনি মেশান। তারপর কড়াইতে অল্প ঘি দিয়ে ঐগুলি ভাজা ভাজা করুন, পদিনা পাতা বা ধনে পাতাও কুচি কুচি করে দিতে পারেন।, এইটি পূর তৈরী হলো। এখন ঐ বেগুনের খোলের ভেতরে ঐ পূর ভর্ত্তি করুন এবং উপরে ডিমের প্রলেপ দিন। তারপর ফ্রাইংপেনে ঘি দিয়ে বেশ বাদামী করে ভেজে তুললেই হলো।

—শ্রীমতী সাহানা রায়

হাঁদার গোল-কিক্ ... ছবি ও কথা

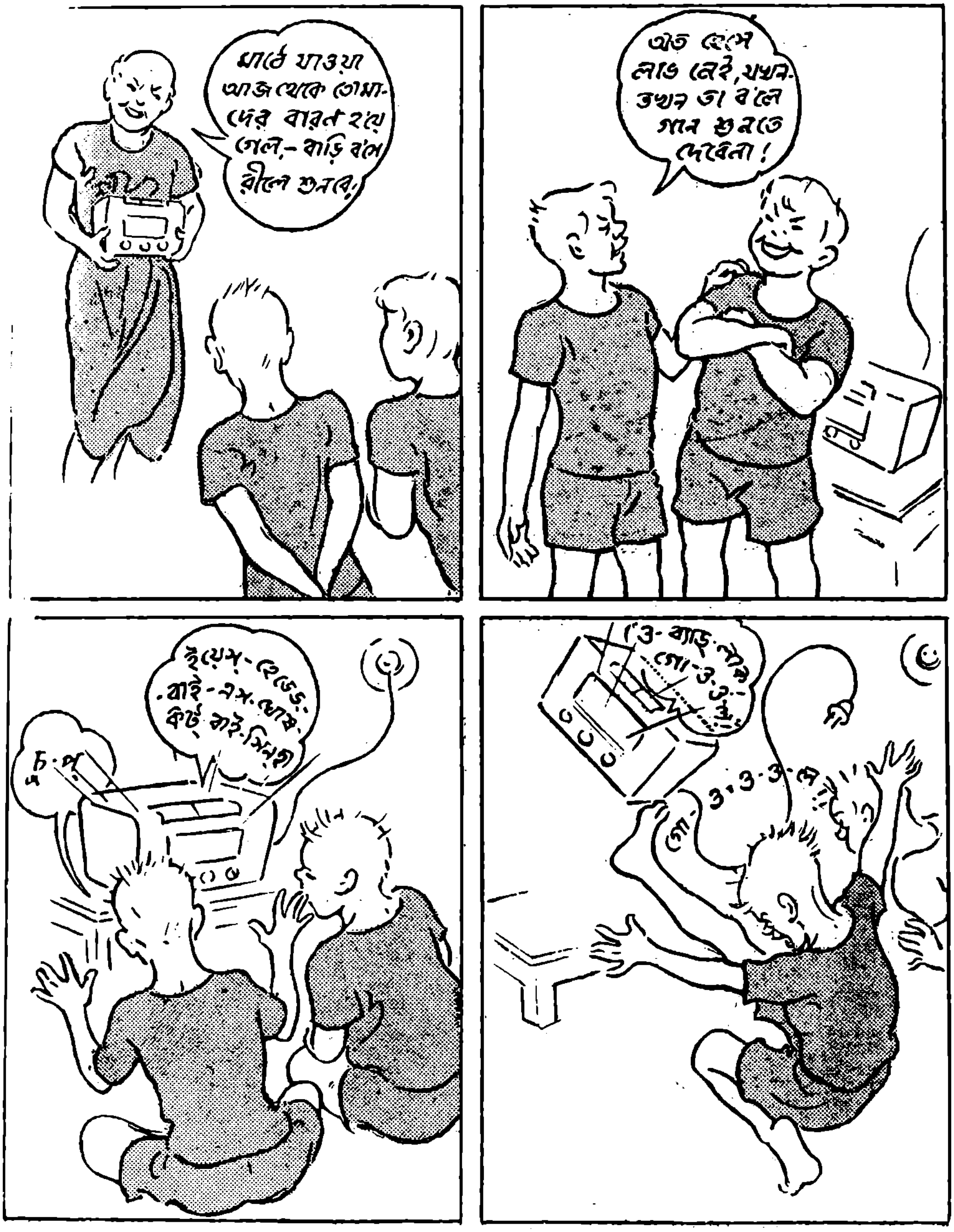

নূতন ধাঁধা

এই চিঠি হইতে কয়েকজন মহাপুরুষের নাম বাহির কর।

ঈশ্বর সহায়

রামরাজাতলা
২২শে মাঘ

ভাই চন্দ্রনাথ,—

আমি তোমার একখানি পত্রে সব অবগত হইলাম। আশা করি সব কুশলে আছ। জগদীশ করুন তুমি যেন বিদ্যালাভ করিয়া পূর্ণচন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ কর। অদ্য এখানে "রঞ্জন" হলে রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি সভা হইবে এবং আগামী কল্য আমি গঙ্গা সাগর যাত্রা করিব। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আমার সহিত যাইবেন, এর মধ্যে তুমি আমাকে "শরৎকালের নির্ম্মল আকাশ" সম্বন্ধে একটি রচনা লিখিয়া পাঠাইও। এখানে সবাই ভাল আছেন, চিত্ত কেমন থাকে জানাইও।

ইতি—

তোমার "মোহন দাদা"

চন্দ্রনাথ দাস
৯৯৯৯ বসু লেন
কলিকাতা—৫০

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। IX থেকে I বাদ গেলে X থাকে।

২। বুড়ো আঙুল

৩। চশমা

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল

খুখু, জয়া ও বেণু—রাঁচী ; মনীশ দত্ত—১২৮৪৪ ; প্রসবকুমার ও সুধীন্দ্রকুমার—১১৯৪৪ ; শোণিত ও ছবি—নৈহাটী ; আরতী, বুলু আলো ও মীণাক্ষী—১০১৮৩ ; নিমাই, নিতাই ও কুমারী শান্তি—১০০৩১ ; অনিল—বিষ্ণুপুর, জামসেদপুর ; গার্গী রায়—১৩৪৪৬ ; নীহার, সুশান্ত, সুধীর, সুবল ও সুভাষ—১৩১০৪ ; আনন্দ দাস—১০৫৪৩ ; হৃষীকেশ দত্ত—১৩৬২২ ; সুখেন্দু বক্সী—১২৪৪৭ ; সুকান্ত দে—১০৩৪৮ ; প্রদীপ ও মুরারি—রাণাঘাট, নদীয়া ; লক্ষ্মণ ও সাধন—সিঙ্গুর, হুগলী ; দীপাঙ্কর ঘোষ—১১১৪৩ ; সুদেব, প্রতাপ ও দিলীপ—১১৩৮১ ; ব্রজেশ্বর চক্রবর্ত্তী—১০০০৭ ; কৃত্তিরঞ্জন বক্সী—দুমকা ; অরুণেন্দ্র রায়—১১৫৪৭ ; রজত বক্সী—১২৪৬৮ ; লক্ষ্মীরাণী মুস্তাফী—দুমকা, বাবুপাড়া ; স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়—হাওড়া ; শৈলেন্দ্র, সাধু, গোবিন্দ, দুর্গাদাস, সুশীল ও ভূতনাথ—রঘুনাথপুর, আদ্রা ; অশোক দফাদার—১২৩৩৯ ; মধুসূদন বাগ—বড়বাজার, রাণাঘাট ; ভোম্বলদা, কল্পনা ও শ্যামলদা—লেক্ রোড, রাঁচী ; দীপক ও দিলীপ—৯৩৯১৮ ; সাধনা, আরতি, মনীষা, বাণী ও অমলেন্দু—আসুলীয়া, নদীয়া ; চিরঞ্জীব ও সঞ্জীব—১১৫৪৬ ; ছোড়দিমণি, দিদি, বাবলু, সঞ্জিত ও অজিত—১০৯৬৭ ; হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ—জামসেদপুর ; সুনীল সেন—১৩৫৩৮ ; টুসান, বাবুল, দেবু ও গায়ত্রী—গোরক্ষপুর ; রেবা ও রেখা—বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ; অবনী, অমূল্য, অশোক ও অরুণ—১০০৫৬ ; রঞ্জন ও পুরবী বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্যামসুন্দর লেন, কলিকাতা ; অচিনকুমার মান্না—সিঙ্গুর, হুগলী ; শিবাজী, হীরু, বিধু, শঙ্কু, সুভাষ ও বাবু—আরারিয়া, পূর্ণিয়া ; সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—১৪১৮৮ ; অজয়, অশোক ও নারায়ণ—১১৫৪৪ ; অরুণকুমার দে—১১৫৪০ ; অর্জ্জুন মণ্ডল—রাধাবন, বিহার ; ব্রজদুলাল, রমেশ ও হিমাদ্রি—রাণাঘাট, নদীয়া ; সুশীলকুমার দে—১২৫৮১ ; কালো, অজিত, রাণু ও পারুল—রাঁচী ; সুবল, শশাঙ্ক, অতুল, গোবর্দ্ধন, কানন ও সাধন—ডিমারীহাট, মেদিনীপুর ; পরমেশ ও জীবেন্দ্র—নৈহাটী ; অমিয়রঞ্জন মণ্ডল—১৩৭০১ ; রবীন্দ্রনাথ সাধুখাঁ—১৩৪৫৩ ; মাণিক, মটর, সত্যগোপাল ও ভাস্কর—রামপুরহাট, বীরভূম ; বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়—দেবপুর বাজার, বর্দ্ধমান ; তরুণ পাঠাগার—১৪৩৫৩ ; শরবিন্দু, নিভা, সৌম্যেন্দু, সুধেন্দু, রীতা ও নন্দী—১৩১৪৬ ; সুহাস, সুহৃদ ও সুব্রত—১৩৭৮৪ ; বনোয়ারীলাল সারাওগী—উখড়া, বর্দ্ধমান ; কানাই ও সন্ধ্যা সরকার—১২৯৩৬ ; কান্তিরঞ্জন দাস—৯৯০১ ; দাশরথি ঘটক—কাটোয়া, বর্দ্ধমান ; সঞ্জিত, রাম, শঙ্কর, ইন্দু, কালিদাস—চাইবাসা ; পরেশ, নদীয়া ও সত্যেন—রামনগর, রাণাঘাট ; শান্তিময়, রণজিৎ, রঘুবীর, কালু, পুষি, শৈলেন ও নিতাই—কদমা, জামসেদপুর ; শোণিত, পশুপতি, দুলাল, কালিপদ, নিমাই, মুকুল, অসিত, রামু ও গান্ধী—নৈহাটী ; শক্তিপদ, মহিতোষ, শম্ভু, বিশ্বনাথ, নিখিল, শান্তি, কৃষ্ণ—দিগপাড়, বাঁকুড়া ; মুরারি, যজ্ঞেশ্বর, সুবোধ, অজিত, রণজিৎ, বিজয়, বিনোদ, গোপাল, হিমাংশু, লক্ষ্মীনারায়ণ, প্রফুল্ল, অধীর, সমীর ও কামাক্ষ্যা দিগপাড়, বাঁকুড়া ; অমর, অরুণ ও চিত্ত—নৈহাটী ; গৌরী, কুমকুম, নীহার, প্রকাশ, সতু ও বিদ্যুৎ—নৈহাটী ; গোপাল প্রামাণিক—নৈহাটী ; এস, জি, কিবরিয়া—১২৮৭৯ ; শোভারাণী—বাজার বাট রোড, নৈহাটী ; রঘুনাথপুর সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী সভ্যবৃন্দ—ডিমারীহাট, মেদিনীপুর ; রঞ্জু, মঞ্জু ও রামাদেব—ডিগবয়, আসাম ; চিন্ময়কুমার—কাটিহার, পূর্ণিয়া ; কমল ও শঙ্কর—ঘাটশীলা, সিংভূম ; কমল, বিমল, শ্যামল ও মনোরঞ্জন—কাটিহার, পূর্ণিয়া ; উমাপদ, নিতাই ও দিব্যেন্দু—ডিমারী হাট, মেদিনীপুর ; কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়—১১২৬০ ; কানু, খুকু, মুকু, গীতা, গজ, নব, গগু ও ছক্কা—আরারিয়া কোর্ট, পূর্ণিয়া ; কিরণ, অজিত, কমল, শ্যামা, অনিলদা, গুণেন্দা, গীতা, বনজিত, বনমালী ও বাবু—বামনাবাদ, মুর্শিদাবাদ ; কুমার চন্দ্রনাথ নন্দী—১০৫৯০ ; কুমারী সত্যব্রত রায়—বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর ; দীপ্তি, মিনতি, সিপ্রা, ছবি ও বেবী—দুমকা, এস. পি ; অর্চ্চনা দাস—১৪৩৩৬ ; দিলীপকুমার রায়—১৩৪৫৮ ; রসানন্দ ও মিহিরকুমার—১০২৬৩ ; হাসি দে—১০১০৭ ; মাষ্টার কোহিনুর, স্বদেশ ও বিবেক—১৪৩৬৩ ; সনৎ, দীপু, ননা ও বিজু—১১৩৮৩ ; পাঁচুগোপাল ও নিরঞ্জন —ঘাটাল, মেদিনীপুর ; তরণীতারণ দাস—বেহড়া, ঘাটশীলা ; বিজয়শঙ্কর গড়াই—পোদ্দার ডি, মানভূম ; সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল=১১১৪১ ; নির্ম্মল, রমানাথ, অজিত ও অমিয়া ; বিনীতা সেনগুপ্ত—নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ; বৈদ্যনাথ ও সনৎ—বাবুপাড়া, দুমকা ; গোপী, ভোলা ও গণেশ—ভাঙ্গামোড়া, হুগলী ; বিশ্বনাথ কুণ্ডু—১০৩৮১ ; অরুণেন্দু সরকার—১৩১৮৭ ; প্রদ্যুৎকুমার ভট্টাচার্য্য—নৈহাটী ; বিষ্ণু ও ব্রজগোপাল—বেহালা, কলিকাতা-৩৪ ; বংশীধারী চন্দ্র—১০২৮১ ; জ্যোৎস্নাময়ী সরকার—১০৭৬৭।

———

নিজস্ব ঘরোয়া চিঠি—

'জয় হিন্দ্'! 'শুকতারা'র গ্রাহক-গ্রাহিকা-রা! বল্‌তে পারো আশ্বিনের সাদা মেঘ আজও কেন তোমাদের বুকের দুয়ারে পূজোর বাজনা বাজিয়ে যায়? শুধু তাই নয়, আশ্বিনের আগমনে মিলনের আশা আজও কি তোমাদের বুকে দোলা দিয়ে যায় না?

আজন্ম এই অনুভূতি নিয়েই তোমরা বড় হয়ে উঠেছ, কার্ত্তিক মাসে পূজো হলেও আশ্বিন মাসই পূজোর মাস বলে সারা বাংলার অধিবাসীদের চোখে রূপায়িত হয়ে উঠেছে! কাজেই ইতিহাসের পরিবর্ত্তন হলেও সেই অনুভূতি যেন আজও আমাদের রক্তমাংসে জড়িয়ে থাকতে চায়!

পাকিস্তানে আজ হিন্দুই বা ক'জনা? আর পূজোই বা হয় ক'টা? তার ওপর জেগে উঠেছে সদ্য-প্রচারিত 'পাস্‌পোর্ট' বা ছাড়পত্রের আতঙ্ক! কাজেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আনন্দ এখন আর সেখানে বান ডেকে যায় না! ভারত-রাষ্ট্রে হিন্দুর সংখ্যা অগণিত বটে, পূজোও হয় অগণিত। কিন্তু সেই 'অগণিত' সংখ্যাও যে বহুল পরিমাণে বাঙালীর একতা-বিরোধী সঙ্কীর্ণ-তারই পরিচায়ক। কাজেই এম্‌নিধারা পূজোর আসরেও আজ আর আনন্দ কই? তা ছাড়া আনন্দের অধিকারী যারা—আনন্দ যারা করবে, অর্থাৎ তোমাদেরই মত কিশোর-কিশোরী,—দুর্দ্দিনের কালোমেঘ আজ তাদেরও অনেককেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! তোমাদেরই কত জনা মুস্‌ড়ে গেছে পরীক্ষায় ফেল্ করে, কেউ ভুগছে চরম দারিদ্র্য ও অভাবের মর্ম্মজ্বালা, আবার কেউ বা বুকে বয়ে বেড়ায় আত্মীয়-স্বজনের বিরহব্যথা বা স্বদেশ ও বাস্তভিটার জন্য উৎকণ্ঠ মধুর স্মৃতি!

বন্ধুগণ! তবু এই ১৩৫৯ সালের আশ্বিনও কি বিজলী-ঝলকের মত চকিতে তোমাদের বুকে একটা সাড়া জাগিয়ে যায় না? মনে রেখো, এই সাড়া বা ক্ষণিকের স্পন্দনই আজ তোমাদের এক-মাত্র সম্পদ্। মুমূর্ষু বাঙালীর এই ক্ষণিক স্পন্দন যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে না যায়, দিনে দিনে এই স্পন্দনের গতি যেন বেড়ে ওঠে আর সারা জাতি-টাকে আবার যেন সঞ্জীবিত করে তোলে, তাই আজ তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হোক্ বন্ধু! বাংলা-দেশের ও বাঙালী জাতটার আজ তোমরাই এক-মাত্র চিকিৎসক ও ভাগ্য-নিয়ন্তা হতে পারো। কেমন করে?—

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে এসো তোমাদের কর্ম্মচাঞ্চল্য, ফিরিয়ে নিয়ে এসো তোমাদের মুখের হাসি ও অক্ষুণ্ণ উৎসাহ। আর সেই সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে এসো তোমাদের দুঃস্থ-দরিদ্র দেশবাসী ভাইবোনদের জন্য দরদ ও ভালো-বাসা। সর্ব্বোপরি, মনে রাখতে হবে—তোমরা সেই দেশেরই সন্তান, অতীতে এই আশ্বিন মাসেই যে দেশে একদিন এক পুরুষসিংহের অভ্যুদয় হয়ে-ছিল! বাংলার সেই পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা

সাগরের নাম আজও যে বাংলার মাটিতে প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশে রয়েছে !

বন্ধুগণ ! একটা জাতিকে বড় করতে বা একটা দেশকে গরীয়ান্ করে তুলতে কি লাখো-লাখো লোকের দরকার হয় ?—না। অতীতে একটিমাত্র ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র প্রমাণিত করে গেছেন যে, বাঙালী জাতিটা নেতিয়ে-পড়া ঘুমন্ত জাতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নয়, তার মনেও আগ্নেয়গিরির সিংহবিক্রম লুকিয়ে রয় ! প্রমাণ করে গেছেন তিনি যে বাঙালীর মর্য্যাদা অবহেলার জিনিষ নয়, তার প্রদীপ্ত আত্ম-মর্য্যাদা প্রবল-প্রতাপান্বিত দম্ভের সম্মুখেও জীর্ণ পাদুকা-শাসনের ইঙ্গিত দেখাতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না !

একটিমাত্র মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র, এ কথাও প্রমাণ করে গেছেন যে, তেজস্বী বাঙালীর উন্নত মস্তক স্বার্থের যূপকাষ্ঠে কখনো আত্মবলিদান করেনি—রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে, সমস্ত প্রলোভনকে পরিত্যাগ করে, দারিদ্র্য বরণ করে নিতে সে মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ করেনি !—অর্থাৎ, সর্ব্বতো-ভাবে তিনি প্রমাণ করে গেছেন, গরীয়সী জন্মভূমি বাংলার তিনি যথার্থই বাঙালী সন্তান, আর তিনিই বাংলার মর্য্যাদা ও জাতির মেরুদণ্ড !

আশ্বিনের "শুকতারা" পড়বার সময় সেই সিংহবিক্রম যথার্থ বাঙালী ঈশ্বরচন্দ্রের কথা তোমরা ভুলতেই পারো না—এ দুর্দ্দিনে আজ তিনিই তোমাদের একমাত্র আদর্শ।

এই একটিমাত্র বাঙালী সেদিন ব্রিটিশ-দম্ভ ও চরম দারিদ্র্যকে যে ভাবে কশাঘাত করে সারা দেশ ও জাতির বুকে যে বৈশিষ্ট্য জুগিয়েছিলেন, আজও আমরা তাই নিয়েই বেঁচে আছি—তাই-ই আমাদের ঐশ্বর্য্য !

একক বিদ্যাসাগর যে সম্পদ্ আমাদের জুগিয়ে গেছেন, তোমরা কি তার কিছুমাত্রই পরিবেশন করতে পারো না ? তেজ ও উৎসাহের দীপ্তি আজও তোমাদের চোখ থেকে মিলিয়ে যায়নি—আর সংখ্যায়ও তোমরা কম নও—লাখো-লাখো কোটী-কোটী !

স্কুল-কোডের প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম্মঘট—

পশ্চিম-বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড 'স্কুল-কোড্' নামে আইন-কানুনের এক খসড়া তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সেটি প্রচারিত হওয়া মাত্র এক সার্ব্বজনীন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কারণ, তাতে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী সকলেই তাঁদের স্বাধীনতা ও শালীনতা সঙ্কুচিত বলে অনুভব করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রথমে বোধহয় যাবতীয় বাদ-প্রতিবাদ ও অসন্তোষকে খুব হাল্কা ভাবেই দেখতে চেয়েছিলেন। তার ফলে বিরুদ্ধ জনমত তুষের আগুনের মত কিছুকাল গোপন থাকলেও অবশেষে ব্যাপক হয়ে পড়ে ও একদিন হাজার

[illegible] ছাত্রছাত্রী স্কুল-কোডের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে বোর্ডের অফিসের সম্মুখে সমবেত হয়। [illegible], সুখের বিষয় যে, বোর্ড কোড্-সংক্রান্ত আলোচনা ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রেখেছেন আর নিয়মাবলী রচনার জন্য ২২ জন সদস্য নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়েছে। কাজেই একথা বলা যায় যে, স্বেচ্ছাচারিতার উৎকট মনোবৃত্তি এখন আর কোনক্রমেই অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব নয়।

বাংলা তার নিজের অংশ ফিরিয়ে পেতে চায়—

দেশ-বিভাগের সর্ত্তে স্বাধীনতা লাভের ফলে পশ্চিম-বাংলা যে কেমন এক দুর্গত প্রদেশে পরিণত হয়েছে, সেকথা আজ আর কারো অজানা নেই। পূর্ব্ব-বাংলার হিন্দু অধিবাসীরা নিরাপত্তার আশায় দলে দলে পশ্চিম-বাংলায় এসে ভীড় জমিয়েছে। কাজেই বাস্তুহারা-সমস্যায় পশ্চিম-বাংলা খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে,—পশ্চিম-বাংলায় এখন স্থানাভাব। তাই পশ্চিম-বাংলা চেয়েছিল যে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশকে পঙ্গু করবার জন্য পশ্চিম-বাংলা থেকে যে অংশ কেটে নিয়ে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই অংশ তাকে এখন ফিরিয়ে দেওয়া হোক্। পশ্চিম-বাংলার বিধান-সভায়ও সে দাবী উঠেছিল আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও সে দাবীর পক্ষেই বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতে বিহারের কোন কোন পদস্থ ব্যক্তি যে অশোভন ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, তা প্রাদেশিকতার ইন্ধন মাত্র।

এ বিষয়ে সহযোগী "যুগান্তর" বলেছেন :—

"একান্ত ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা অকারণ ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই 'তিক্ততা সৃষ্টির' পথ প্রদর্শন করিতেছেন। কিসের তিক্ততা, কেনই বা তিক্ততা? পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির প্রস্তাব নিশ্চয়ই অন্যায় বা অসমীচীন নহে।"

পশ্চিম-বাংলার অন্যতম প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেছেন :—

"সেরাইকেলা ও খরসোয়ান মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও উড়িষ্যার অংশ ছিল এবং উড়িষ্যার সহিত তাহাদের ঐতিহাসিক যোগ ছিল। কিন্তু সেরাইকেলা ও খরসোয়ানকে উড়িষ্যা হইতে বাহির করিয়া লইয়া বিহারের সহিত যুক্ত করা হয়। এই ক্ষেত্রে যদি বিহার বিবেকের কোন দংশন অনুভব করিয়া না থাকে, তাহা হইলে যে ক্ষুদ্র অঞ্চল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার অংশ ছিল তাহা ছাড়িয়া দিতে এত উত্তাপ ও উত্তেজনার সৃষ্টি কেন হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে আর বেশী বাদানুবাদ হওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, তার ফলে প্রাদেশিকতার তিক্ততাই শুধু বেড়ে যাবে। বিহারের অধিবাসী যে সব ভদ্রলোক সম্প্রতি কলকাতায় বাস করছেন, পশ্চিম-বাংলার দুঃখ-দুর্দ্দশা ও পশ্চিম-বাংলার যুক্তি ও মনোভাব তাঁরা সম্ভবতঃ সহজেই বুঝতে সমর্থ। এ সম্পর্কে তাঁদেরও একটা যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়া সঙ্গত।

মালয়ের উগ্র শাসক স্যার টেম্পলার—

মালয়ের বর্ত্তমান হাই-কমিশনারের নাম স্যার গেরাল্ড টেম্পলার। খবরের কাগজে প্রকাশ, গত ১৫ই আগষ্ট উত্তর-মালয়ের পার্মাতাংতিঙ্গি গ্রামে একজন চীনা অফিসার নিহত হন। এতে টেম্পলার সাহেব প্রথমে হুকুম জারী করেন গ্রামবাসী কোন লোকই তার বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে না। আর হত্যাকারী কে, তা যদি তারা বলে না দেয়, তাহলে তাদের আরো কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এর পরও হত্যাকারীর কোন সন্ধান না পাওয়ায় গত ২৫শে আগষ্ট স্যার টেম্পলার ঐ গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে গ্রেপ্তার করে বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রচণ্ড বৃষ্টি বা ছোট-বড় সকলের ক্রন্দন স্যার টেম্পলারকে বিন্দুমাত্র সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি!

কিছুকাল যাবৎ মালয়ের রক্ষিবাহিনী যে সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, তা সামরিক অভিযানেরই নামান্তর মাত্র। নির্ম্মম অত্যাচারের মাপকাঠিতে টেম্পলার সাহেব এরই মাঝে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছেন সন্দেহ নাই। এর আগে তিনি অপর একটি গ্রামের সম্পূর্ণ রেশনই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, এমনি ধারা অত্যুৎসাহী শাসকরাই যুগে যুগে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছেন। অসন্তুষ্ট গণ-দেবতার অভিশাপে মালয়ের ইতিহাসও একদিন পরিবর্ত্তিত হতে বাধ্য।

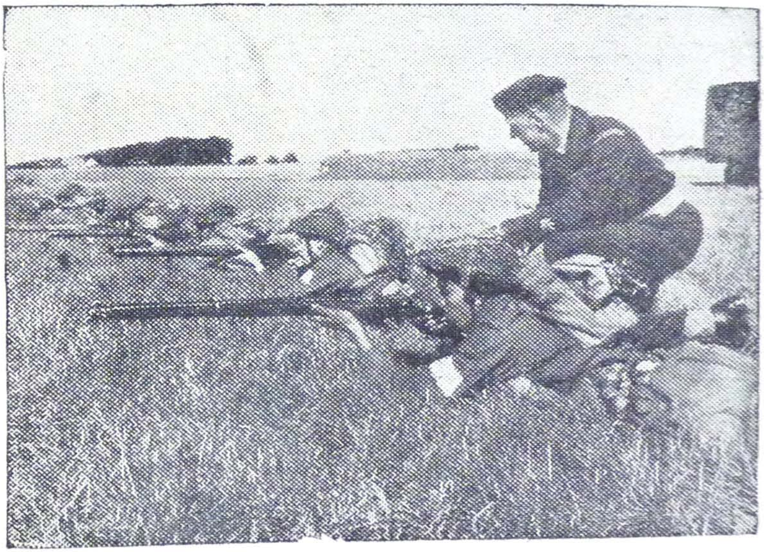

অলিগলি পথঘাট ও শস্যক্ষেত্র, মালয়ের সর্ব্বত্রই তার অতি-সতর্ক রক্ষি-বাহিনীর সামরিক মহড়া চলছে।

এলাহাবাদের "অমৃত"-সংবাদ—

এলাহাবাদের একখানি হিন্দী দৈনিক কাগজের নাম "অমৃত"। কলকাতার বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকার" ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ "অমৃত" কাগজেরও ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টার। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে উক্ত "অমৃত" কাগজের ৫ই আগষ্টের সংখ্যায় শিশু-বিভাগে নাকি এমন কিছু লেখা বেরিয়েছিল, যা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষোভের কারণ হতে পারে। কার্য্যতঃ হলোও তাই। দাবানলের মত সেই সংবাদ নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের প্রতিবাদসূচক শোভাযাত্রা বেরোতে থাকে। ১৪৪ ধারা অমান্য করতেও তারা ইতস্ততঃ করেনি। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-উৎসবও কৃষ্ণ-পতাকায় কলঙ্কিত হয়ে ওঠে। "অমৃত" পত্রিকার সম্পাদক এই

পরিস্থিতির জন্য উপর্য্যুপরি দু'সংখ্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষও "অমৃত" পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সহ-সম্পাদকটিকে পদচ্যুত করতে নির্দ্দেশ দিলেন, নিজে ক্ষমা প্রার্থনাও করলেন মুসলমান ভাইদের কাছে।

এদের দুজনকেই ক্ষমা করা গিয়েছিল, ব্যাপারটা এইখানেই মিটে যাবে। 'অমৃত' পত্রিকা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, ডিরেক্টার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও পদচ্যুত হলেন, তারপরে আর বাকি রইলো কি? তবুও উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক-মুদ্রাকরকে এলাহাবাদের বিচার-বিভাগীয় সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত-রাষ্ট্রে মুসলমান-ধর্মীর স্বার্থ যে কত বেশী সুরক্ষিত, তাদের পক্ষে আপত্তিকর লেখা কোন কাগজে দৈবাৎ প্রকাশিত হলেও যে কি বিপজ্জনক, "অমৃত" কাগজের ব্যাপারে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা কাগজের মর্য্যাদার পক্ষে যা সবচেয়ে বেশী হানিকর, নতজানু হয়ে পত্রিকার সেই ক্ষমা প্রার্থনাও এখানে নিষ্ফল হয়ে গেল!

স্বার্থের দুন্দুভি বাজলো!—

পশ্চিম-বাংলার সর্ব্বত্র এখন স্বার্থের দুন্দুভি বেজে উঠেছে! নির্ব্বাচনে পরাজিত হলেও মন্ত্রিত্ব লাভের ফিকির থাকে আর মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর দলবল মিলে বিপুল আয়োজনে রাজ্য শাসন করা যায়, এতদিন এই পর্য্যন্তই আমরা দেখেছিলাম। এখন আবার কানে আসছে, দাবী উঠেছে—কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের মাইনে দিতে হবে মাসে ২০০৲ টাকা করে, আর তাঁদের কার্য্যকাল তিন বছর থেকে বাড়িয়ে যেন পাঁচ বছর করা হয়। কর্পোরেশনের কাউন্সিলদের নাকি বড্ড বেশী পরিশ্রম করতে হয়, কাজেই এমন একটা দাবী উঠেছে। অথচ এ কাজ এতদিন ছিল অবৈতনিক, আর অবৈতনিক ছিল বলেই তা ছিল এত সম্মানের। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, বলতে পারো কে তোমাদের মাথার দিব্যি দিয়ে এই কাজে নামতে বলেছিল? ঢাক-ঢোল-ভেঁপু বাজিয়ে, তোমরাই দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছিলে আর বলেছিলে, "আপনারা আমাকে ভোট দিন—দয়া করে আপনাদের সেবার অধিকার দিন।"

এখন সেই 'সেবার' বিনিময়ে টাকার কথা মুখে আনার মানেই হচ্ছে চরম নির্লজ্জতা ও স্বার্থপরতার এক শেষ! তবু দাবী যদি তাঁদের পূর্ণই হয়, তাহলে মনে রাখতে হবে, কর্পোরেশনের এই কাউন্সিলররা হচ্ছেন দু'শ টাকা মাইনের কর্ম্মচারী—অস্থায়ী কর্ম্মচারী—মাত্র তিন বা পাঁচ বছরের জন্য! কাজেই সে জন্য তাঁদের প্রয়োজন হবে বাধ্যতামূলক ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতি, আর দু'শ টাকা মাইনের অস্থায়ী কর্ম্মচারীর যতটুকু মর্য্যাদা, ততটুকু মর্য্যাদারই তাঁরা অধিকারী, তার বেশী নয়।

"বন্দে মাতরম্!"

ভারতমাতার বাণী